যদি রাধা না হ'ত

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮

দৃষ্টিকোণ

''শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' -এর পাঠক-পাঠিকাদের অনেক কালের চাহিদা ও অভাব পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশিত হলঃ ''যদি রাধা না হ'ত।''

'শ্রীকৃষ্ণ পুরুযোত্তম' শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী ছেঁকে শ্রীকৃষ্ণকে নতুনরূপে দেখেছি। এই জীবন বৃত্তের ভেতর শ্রীরাধা কোথাও নেই। তাই শ্রীরাধার কালজয়ী স্বর্গীয় প্রেমকে সত্যের খাতিরে উপরোক্ত উপন্যাসের আয়তরেখায় ধরাতে পারিনি।

প্রকৃতপক্ষে পুরাণে রাধা এসেছে কৃষ্ণের অনেক পরে। ইতিহাস বড় নির্মম! যুগ-যুগান্তরের সংস্কার আর বিশ্বাস ভাঙতে এবং প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে বলা প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের বহুবছর পর রাধাকে পেলাম। শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী প্রেমের সঙ্গে মিশে রাধা কবি মানসী হয়ে ওঠল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে। রাধা মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়, পরাণবঁধু— শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি।

উৎস থেকে মোহনার দিকে গেলে দেখতে পাই, পান্ডব বংশের অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত রাধার স্বামী আয়ান হয়ে

জন্মান। তাহলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহুবর্ষ পরে এবং শ্রীকৃষ্ণের তিবোধানের পরে কালজয়ী অমর প্রেম কথার অনন্যা নায়িকা শ্রীবাধা এসেছে মানুষের কল্পনায়। কিন্তু কি করে যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হল এটাই পরমাশ্চর্য! সেই পরমাশ্চর্যের আর এক বিস্ময় হল শ্রীরাধা; বয়সে কৃষ্ণ অপেক্ষা বড়। অর্থাৎ রাম না হতে যেমন রামায়ণ তেমনি কৃষ্ণ না হতে রাধা। বাস্তব ঘটনার ঠিক বিপরীত। তাই আয়ান সম্পর্কে এই তথ্যটি ত্যাগ করতে হয়েছে। আয়ানকে আবার পুরাণের এক শাপগ্রস্ত ঋষি বলা হয়েছে। এই উপাখ্যানটি গ্রহণ করলে রাধা কৃষ্ণের চিরন্তন প্রণয় কাহিনী একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে আমি উক্ত উপাখ্যানকে অবলম্বন করেছি।

পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়ে দাহ, জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ, উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা, ভয় নিন্দা সব কিছু মানব-মানবীর রক্তমাংসের প্রেমেব এক বাস্তবঘন রূপ আঁকা হয়েছে। তাই আত্মদানের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করতে পারিনি। এই সংকীর্ণতা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে ভক্তির নামে কদর্য দেহবদ্ধ প্রেমের এক নির্লজ্জ রুচিবিকার আমদানি করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে পৃথিবী এবং জীবন বোধ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। সেই পরিবর্তিত জীবন-বোধের সঙ্গে অন্বিত করে রাধা কৃষ্ণের কালজয়ী প্রেমের বংশীধ্বনি করেছি। বংশধ্বনি কৃষ্ণ প্রেমের সজীব প্রতীক। বাঁশীর সুরে রাধা তাই আকুল হয়। ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। সংসার বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। রাধার নিদ্রিত সত্তার ঘুম ভাঙে। আত্মার ভেতর, সমস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর খুঁজল সে তার কৃষ্ণকে। এই অন্বেষণের সূত্র ধরে বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানের ভেতর নিরন্তর পরিভ্রমণ করেছে। আর সেই সূত্রেই তার আত্ম-

অন্বেষণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাধার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে কার্যত কোন বই নেই বললেই হয়; যা পেয়েছি তাতে বিকৃত কাম ক্ষুধার ফাঁদে রাধা-কৃষ্ণ বন্দী। যে কৃষ্ণ ভারতীয় জীবনের আদর্শ, যিনি মহান, আদর্শবান, শ্রেষ্ঠ বীর, জণগণমন অধিনায়ক, যাঁর ছত্রছায়ায় গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, যিনি পুরুযোত্তম, ভীষ্ম যাঁকে শ্রেষ্ঠ পুরুষের অর্ঘ্য দিয়েছে সেই মহামানব কখনও চরিত্রহীন, লম্পট, কামুক হয়? না, হতে পারে? 'যদি রাধা না হ'ত' উপন্যাসে আমি কৃষ্ণ চরিত্রের এই কলঙ্ক স্খালন করেছি। গোপীদের বস্ত্র হরণ, নৌকায় রাধিকার শ্লীলতাহানির মত আজগুবি গল্প অন্যভাবে বিচার করেছি। জীবাত্মা-পরমাত্মার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে যাঁরা ঐ ঘটনাগুলোকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী আমি তাঁদের দলে নই। স্থূল চোখে ঘটনাগুলো কৃষ্ণ চরিত্রের গৌরব মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ায় না আবার কোন সত্যকে প্রকাশ করে না। তাই মানুষের শুভবুদ্ধি এবং তৎকালীন দেশ-কালের রূপরেখায় তাকে বিধৃত করেছি। রাধা-কৃষ্ণর লৌকিক উপাখ্যানের যে জনপ্রিয়তা আমাদের ধ্যান-ধারণা আচ্ছন্ন করে আছে তার মোহ থেকে এই উপন্যাসকে মুক্ত করে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে রাধা চিত্ত আবর্তিত হয়েছে।

রাধার মানবিক প্রেমের স্বর্গীয় দীপ্তি সঞ্চার করতে আমার উপন্যাসে স্বামী আয়ানের অবদান খুব বেশী। অভিশপ্ত ঋষি পরজন্মে আয়ান হয়ে জন্মালে তার ভেতর ঋষিসুলভ ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা ছিল। আমার মনে হয়েছে লৌকিক কাহিনীতে আয়ানের এই মহানুভবতা, উদারতা এবং মহত্বকে ক্লীবরূপে দেখানো হয়েছে। আয়ান সম্পর্কে এই ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে আমি কুঠারাঘাত করিছি। তাই তো রাধার

যেটুকু আত্মযন্ত্রণা, জ্বালা, হাহাকার সে তো আয়ানের জন্যই। আয়ানের নিঃস্বার্থ মহান প্রেম, নীরব আত্মদানের মহিমা রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমকে ভরন্ত কলসের মত ভরিয়ে তুলেছে। মোটামুটিভাবে, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে আধ্যাত্মিক দিক ও দার্শনিক দিক আছে তাকে গ্রন্থের কলেবরে অটুট রাখার চেষ্টা করেছি। প্রচেষ্টা সফল হল কতখানি পাঠকই তার বিচার করবেন।

গ্রন্থের কলেবরে প্রেমের অনির্বচনীয় রূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যত্রতত্র ব্যবহার করেছি। সংলাপকে অর্থবহ করতে কখনও কখনও কবিতার মূল শব্দ পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।



যমুনার বুক থেকে বাঁশীর সুরের মিষ্টি আওয়াজ বয়ে নিয়ে এল দখিনা বাতাস। কত জায়গায় কত গাঁ, গঞ্জ, শহর ছুঁয়ে রাধার কানে কানে ফিস ফিস করে শুধাল:

ওই শোন রাই, মুরলী বাজায়
তোর শ্যামরায়।

রাধার বুকের ভেতর জলপ্রপাতের শব্দ। অভিমানের সমুদ্র উথলে উঠল হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ঘুমের মধ্যে চোখ মেলল রাধা। এদিক ওদিক চেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

মধ্যরাত।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না। পৃথিবীময় নরম চাঁদের আলো। বনফুলের গন্ধের সঙ্গে রাতের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ মিশল।

স্নিগ্ধ মায়াবীরাত কি সুন্দর! কেবল ঐ বাঁশীর সুরে রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ হচ্ছিল। ঐ সুর রাধার বুকের ভেতর নরম সব কিছুকে কার্পাস তুলোর মত পিঁজে পিঁজে আকাশময় ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আকাশের তারাগুলো কত উজ্জ্বল! বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোটা আকাশ দেখতে পেল না রাধা। চোখের সামনে আধখানা আকাশ প্রশ্ন চিহ্নের মত হাঁ করে চেয়ে আছে তার দিকে। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন—আজ এই প্রশ্ন রাধার মনের ভেতরেও। তবে কি শ্যাম মথুরা থেকে ফিরল? রাধার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। পায়ের নীচে মৃদু একটা ভূমিকম্প টের পেল। মনে হল, তার পা আর মাটিতে নেই। সে এই রাজ্যেও নেই। কোন এক সুদূর অতীতের মধ্যে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। সমস্ত অতীত বর্তমান জুড়ে ঐ বাঁশীর সুরের মহোৎসব চলছে তার ভিতরে।

দূরে গোপপল্লীতে সমস্ত প্রাণ, মন, দরদ ঢেলে দিয়ে নিবিষ্টমনে কে যেন রাখালিয়া সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। এমন মিষ্টি বাঁশীর সুর বৃন্দাবনে অনেককাল শোনে না কেউ। শুনবে কোথা থেকে? বাঁশী বাজানোব মিষ্টি হাত ছিল কৃষ্ণের। তার বাঁশীর সুরে বাতাস মধুর হয়, হৃদয় উতলা হয়, এক অনাবিল প্রশান্তিতে, সুখে, আনন্দে, প্রাপ্তিতে চিত্ত ভরে ওঠে। মুগ্ধতা ও ভাবাবেশে দু'চোখ বুজে যায়। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। কিন্তু অনেক কাল হল কৃষ্ণ বৃন্দাবন গোলক ত্যাগ করে মথুরায় গিয়েছে। হঠাৎ তার বাঁশীর সুরে রাধার ভেতবটা মৃদু কাঁপছিল আশায়, আকাঙ্ক্ষায় ও উদ্বেগে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল রাধার। চোখ বুজে এল জলে। বাঁশীর সুর তার মনের মধ্যে মিশে গেল। ঐ সুর যেন সহসা কথা হয়ে বাজল তার কানে।

বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা—

বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল রাধার। একটা স্মৃতি জ্বলে ওঠল।

নৃত্যের মুদ্রায় কৃষ্ণ দু'হাতে বাঁশী ধরে তাতে অধর সংস্থাপন করে রাধার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। দু চোখে তার কৌতুক উপচে পড়ছে। হঠাৎ বাঁশী বেজে ওঠে। মনমাতানো রসে টৈটুম্বুর হয়ে আঁখিতাবা দুটি বুজে যায় কৃষ্ণের। মুগ্ধতা নামে রাধার দু চোখেও। সেই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মনকে প্লাবিত করে দেয়। অধরের টেপা হাসি তার প্রেমের মুক্তা হয়ে ওঠে।

রাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণের বুক কাঁপল। মুখ শুকিয়ে গেল, গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। রাধার স্খলিত বসনপ্রান্তের স্পর্শে থরথরিয়ে উঠল কৃষ্ণের ভিতরটা। বাঁশীর সুর থেমে গেল। চোখের চাহনি অনুরাগে নিবিড় হল। মনের এমন আকুল উদ্বিগ্নতা চেপে রাখা অসম্ভব হল কৃষ্ণের। বলল তোমাকে যে আমি ভালবাসি রাই।

রাধা একটুও চমকাল না। সে ঠিকই জানত কৃষ্ণ তাব কাছে আসবেই। কানের কাছে বাজবে প্রেমেব গুঞ্জন। শোনার জন্য রাধাও ছিল উন্মুখ হয়ে। কৃষ্ণের কথার উত্তরে শান্ত গলায় বলল, আমিতো চাই তোমাকে।

কথাটা বলে রাধা কেমন থমকে গেল। মনের ভেতব তার প্রতিবাদের ঝড় উঠল, এ পাপ, এ অন্যায়। নিজের কাছে সে সত্যভঙ্গ করেছে। পরক্ষণেই প্রশ্ন করেছে কি সে সত্য? বাধা জানে না তার উত্তর। জানার মত মনেব অবস্থাও তখন নয়।

কৃষ্ণের ছোঁয়া লাভেব জন্য সর্বাঙ্গ তখন ব্যাকুল।

তবু সংস্কার যায় না। মন থেকে মুছেও মোছে না। বাধাব মনে হিন্দু নারীর বিবাহের সংস্কার নানা কথা বলে যাচ্ছে। কান তার ঝাঁ ঝাঁ করছে। অসহনীয় জ্বালায় জ্বলছে বুকেব ভেতব। পাপবোধ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।

কৃষ্ণের দিকে দু হাত জোড় করে বলল· ভুল। সব ভুল। সব মিথ্যে। তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমায়।

কৃষ্ণ কথা বলল না। দু হাত বাড়িয়ে রাধাব হাতটা ধরল।

করপদ্মের মধ্যে চেপে ধরল। কৃষ্ণের হাতের নরম স্পর্শে রাধা যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে ওঠল যেন। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল। সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করল কৃষ্ণের অস্তিত্বের স্পর্শ। কৃষ্ণ রাধার হাত নিজের হাতে রাখল। রাধার হাত কত ফর্সা, আর কত সুন্দর ... ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। আর সরল ঈর্ষামিশ্রিত চোখে রাধার দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ করে হাসতে লাগল।

অনন্ত সময় বয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ রাধার হাত নিয়ে খেলা করতে লাগল। হাতের উপর মাথা রাখল। মুখ রাখল। অজস্র চুমু খেল। আদর করল কত ভাবে। রাধার সাধ্য কি হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কৃষ্ণের মুঠো থেকে। সে ছাড়তে চাইছিলও না, চাইছিল শুধু কৃষ্ণের ভুজবন্ধন। কৃষ্ণ একটু বুকে টেনে নিক, তাদের দু জনের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু আছে সেটা একেবারে ভেঙে ফেলুক।

কৃষ্ণের হাতের সুখকর স্পর্শে রাধার সমস্ত অনুভূতি স্পন্দিত হতে লাগল। হাতটাই যেন কৃষ্ণের শরীর হয়ে উঠল। কৃষ্ণের ভিতরটা মোমের মত গলে গলে পড়ছিল। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। দুহাতে রাধাকে বুকে টেনে নিল। তার বুকে মুখ ঘষল, কান পেতে শুনল—গভীরে, খুব গভীরে আশ্চর্য কোন জন্মান্তরের সুর বাজছে কিনা? কতক্ষণ এভাবে কাটল জানে না। চেতনা ফিরলে দেখল, কৃষ্ণের ভুজবন্ধনে বন্দী সে। আর তার মুখ নিজের মুখের ওপর নেমে এসেছে। শুধু তাই নয়, তার মুখের ভেতর কৃষ্ণের মুখের স্পর্শ অনুভব করল। সারা শরীর যেন নিবিড় সুখের উল্লাসে গান গেয়ে ওঠল।

মম নন্দন অটবীতে—
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি।

শুধু শুচিতা রক্ষার জন্যে রাধা কৃষ্ণের ভুজবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে

কৃষ্ণকে দু হাতে ঠেলে দিতে গেল, কিন্তু পারল না। পারবে কোথা থেকে? তার তনু মন প্রাণ যে কৃষ্ণের অঙ্গের নবম মধুর স্পর্শে শিথিল হয়ে পড়েছিল। দেহে কোন বল ছিল না। শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পাবছিল না। তার নিঃশ্বাস ভরে ছিল কৃষ্ণের দেহের সুবাস আব চুলের মিষ্টি গন্ধ। রাধার অপলক দুটি আঁখি ধ্রুবতারার মত স্থির হয়ে আছে কৃষ্ণেব ওপর। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপ জ্বালিয়ে রাধা কৃষ্ণকে দেখছিল। বুকের ভেতরটা তার গুনগুনিয়ে ওঠল। মনে মনে বলল—

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামের শোভা।
পীত বসন জণু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা।

বিস্রস্ত আঁচল বেশবাস ঠিক করে নিতে নিতে রাধার মনে হল তাব কাছে গোটা পৃথিবীর অর্থটা বদলে গেছে। কৃষ্ণের ভালবাসায় মন কানায় কানায় ভরে গেছে। মনে আর একটুও পাপবোধ নেই। অনুশোচনাও নয়। আর এসব হবেই বা কেন? ভালবাসায় তো কোন পাপ নেই। ভালবাসাই ঈশ্বর।

সেদিন রাতে রাধার ঘুম এল না। কৃষ্ণেব স্পর্শটা তখনও তার তনুতে লেগে ছিল। বুকের ভেতর দামামার মত কি যেন বেজে যেতে লাগল। পাশে ঘুমন্ত স্বামী আয়ানের দিকে চোখ পড়তে সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতি কতরকম প্রশ্ন করল তাকে। কৃষ্ণের সঙ্গে যা ঘটে গেল তা তো একটা শরীরী ব্যাপার। কিন্তু তার শরীর তো স্পর্শিত। তাহলে দৃষ্টিমাত্র এরকম হল কি করে? এ কি সত্যভঙ্গ নয়? স্বামীর সঙ্গে মিথ্যে আচরণ নয় কি? রাধা আয়ানকে দেখছিল। কেমন একটা অপরাধবোধে তার বুকেব ভেতর গুরুগুরু করে ওঠল। রাধার ইচ্ছে হল এই মুহূর্তে আয়ানের গলা জড়িয়ে ধরে আদর কবতে। কিন্তু তাব বিবেক

প্রতিবাদ করল যেন—না, স্বামী শুধু একটা সংস্কার। ভালবাসা তার চেয়ে বড়। ভালবাসা হল জীবনের প্রকাশ। ভালবাসায় পাপ নেই। আর পাপ হবেই বা কেন? সে তো বাঁধা দিয়েছে তাকে। পাপ যদি হয়ে থাকে কৃষ্ণের। পুরুষের এতে কোন পাপ হয় না। তাদের চরিত্রও নষ্ট হয় না।

'বিস্ময়ের শেষ নেই রাধার। বিশ বছব আগেব জীবনটা এখনও তাব ভেতর তেমনি আছে। কালের কোন চিহ্নই তার গায়ে লাগেনি। তাব নিজেব চেহাবাটা কেবল বদলেছে। দর্পণেব সামনে দাঁড়ালে দুঃখ বাড়ে মন খাবাপ হয়ে যায। কিন্তু মনটা? মনের তো কোন সীমাবদ্ধতা নেই। বিশ বছরের গন্ডীটা সে তুলে দিয়েছে। মধ্যরাতেব বাঁশীব সুব বিশ বছরের দূরত্বটাকে মুছে দিযেছে।



শোবার ঘরে স্বামী আয়ান অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কি গভীর প্রশান্তি মাখানো তার মুখ। কি গভীর ভালবাসা আর বিশ্বাস তার মনে। কোন ক্ষোভ নেই, ঈর্ষা নেই, জ্বালা নেই, সন্দেহ নেই, —ভক্ত পূজারীর মত নিজেকে শুধু নিবেদন করে, পূর্ণ করে। তার পৃথিবীটা তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে রবি, শশী, তারার মত প্রেমের দীপ জেলে প্রদক্ষিণ করছে তাকে।

লোকটা সব জানে, তবু কোন রাগ নেই, ঘৃণা নেই। কোন অতৃপ্তিও না। দুঃখ যন্ত্রণা যদি কিছু থাকে সে আছে তার ভিতর। মরুভূমির মত সর্বদা তেতে আছে অভ্যন্তরটা। বিশ বছরের মধ্যে কবে যে তাপটা জুড়িয়ে গিয়েছিল রাধা জানতেও পারেনি। মধ্যরাতের বাঁশীর সুর সব গন্ডগোল করে দিল। আর ভিতরের আমি'র ঘুম ভাঙল। ঐ সুরের ছোঁয়ায় ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। বিশ বছর আগের সব ঘটনা এক এক করে মনে পড়ল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধা দেখতে পাচ্ছিল স্বামীর ঘুমন্ত মুখ। তার কাঁচা-পাকা ঢেউ খেলানো কোঁকড়া চুলে পড়েছে জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলো। ভীষণ সুন্দর লাগছিল আয়ানকে। সত্যিই সুদর্শন সে। এখনও শরীরে তার যৌবন টলটল করছে। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে রাধা আয়ানের দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের ভাবনাতে নিজে বুঁদ হয়ে থাকল। অতীতকে মনে পড়ল। বর্তমানের মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিল না। বাঁশীর সুর বার বার তাকে অতীতের দিকে টানছিল। তিরিশ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ল।

জীবনের চল্লিশ বছর কেটে গেল। তবু কি আশ্চর্য, সেই দৃশ্য ও ঘটনাগুলো এখনও মনের ভিতর সেই রকমই আছে। কাল তাকে জীর্ণ করেনি। বরং আরো উজ্জ্বল করেছে।

সে দেখতে পাচ্ছিল তার বাবা মা'র কলহ। পিতা বৃষভানু দশ বছরের একরত্তি মেয়েকে কিছুতে বিয়ে দিতে রাজী নয়। জননী কীর্তিকাও ছাড়ার পাত্রী নয়। বৃষভানুর কোন ওজর

আপত্তি সে শুনতে চায় না। মেয়ের বিয়ে তার চাই-ই। রাধা তাদেব কলহের মধ্যস্থতা করে দিল। কচি গলায় বলল: বাব্বা। শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। থাম তো। আমি বাবাকে বিয়ে করব তাহলে মার কথাও থাকবে, আর বাবাকেও আমার জন্যে কষ্ট পেতে হবে না। আমি বাবার কাছেই থাকব।

রাধার কথা শুনে বৃষভানু হাসিতে ফেটে পড়ল। কীর্তিকাও না হেসে পারল না। সেদিনের মত কলহের ইতি ঘটল।

কিছুদিন পর আবার পুরনো কলহের সূত্রপাত। বৃষভানু কীর্তিকাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। বলল: ফুল ফুটলে যেমন মধুকর আসে, তোমার মেয়ের বয়স হলে তেমনি পাত্র আপনি এসে জুটবে। তোমার আমার খোঁজাখুঁজির কোন দরকার নেই। বিয়ে তো দিতেই হবে। যতদিন পারা যায় একটু কাছে থাকুক না।

কীর্তিকা ঝংকার দিয়ে বলল: তুমি কিছু বোঝ না। দিনকাল ভাল নয়। ঘরে মেয়ে রাখাই দায় হয়ে ওঠেছে। চতুর্দিকে যা দেখছি, ঘেন্না ধরে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পাব বিদেয় কর। পরের জিনিষ পরের ঘরে না পাঠানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। জান, সই যশোদা একটা ভাল সৎপাত্রের সন্ধান দিয়েছে। আভীর পল্লীর ঐ আয়ান! ছেলেটি নাকি দেখতে খুব সুন্দর। ভালো ছেলে, সৎ, নম্র এবং সরল।

বৃষভানু কুপিত হয়ে বলল: আরে রাম, রাম, সে কি একটা বলার মত পাত্র?

সব তাতে তোমার নাক কুঁচকানো স্বভাব।

আরে তা নয়। ওর কোন ব্যক্তিত্বই হয়নি।

ওরকম নিরীহ ছেলেই ভাল। আমার রাই-র খুব বাধ্য থাকবে। বেশী দামাল হলেই তো ভাবনা। মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ডুবে থাকবে। ঘরের লক্ষ্মী চোখের জলে ভাসবে। কাজ নেই আমার ব্যক্তিত্বের। আমার মেয়ে কিসে সুখী হবে সেটাই তো দেখব।

দ্যাখ, মেয়ে আমার সুন্দরী। তাকে বৌ পাওয়া পুরুষের

ভাগ্য। অমন সোনার প্রতিমাকে অযত্ন অবহেলা করার মত পুরুষ মানুষ জন্মায়নি। বুঝলে রাণী, অমন সুন্দরী বৌ-এব আঁচল ধরে বেড়াতেই পুরুষের বেশি সুখ।

ছিঃ! বাপ হয়ে মেয়ের সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে তোমার একটু সরমে লাগল না?

খারাপটা আমি কি বললাম? মেয়ের রূপ নিয়ে বাপের বুকে যে ছোট্ট দেমাকটুকু আছে সেটুকু দেখানো দোষ? পাপ? অপরাধ? মেয়ের ওপর অবিচার তো তুমি করছ। আয়ান শুধু আকৃতিতেই পুরুষ মানুষ। মেয়েকে আমি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারব না।

কীর্তিকা বৃষভানুর গলার স্বর অনুকরণ করে মুখ ভেংচে বলল: জলে ফেলে দিতে পাবব না। খুব বাহাদুরীর কথা। তোমাদের মত কয়েকটা অপদার্থ পুরুষমানুষেব আদিখ্যেতায় দেশটা গোল্লায় গেল। দিনে দুপুবে মেয়েমানুষ নিয়ে ঢলাঢলি, টানাটানি যে ভাবে বাড়ছে তাতে মেয়েকে ঘরে রাখাই দায় হয়ে ওঠেছে। সোমত্ত মেয়ে পথে দেখলে পাড়ার ছোঁড়াগুলো তাকে খাবলে খায়। কিন্তু বলতে গেলে রক্ষে নেই। কেলেঙ্কারীর ভয়ে মেয়েগুলো মুখ বুজে সহ্য করে। কি করবে বল? দেশেতো একটা পুরুষ মানুষ নেই। আকৃতিতেই তারা পুরুষ। আয়ানের মতই নিরীহ। আর ব্যক্তিত্বহীন।

বৃষভানু কথা বাড়াল না। হাব স্বীকার করে নিল। কেবল নিজের পৌরুষ দেখানোর জন্য কীর্তিকার দিকে কটমট করে তাকাল। ঐ তাকানোর ভিতর বৃষভানুর যে বেদনা ছিল, যন্ত্রণা ছিল, অসহায়তা ছিল; তিরিশ বছর পার হয়ে গেলেও রাধা মর্মের মধ্যে তাকে অনুভব করতে পারল। কথাগুলো কীর্তিকা বৃষভানুকে বিদ্ধ করার জন্য বলেছিল। কীর্তিকার কথাগুলো সত্যকে প্রকাশ করলেও বৃষভানুর গৌরব বাড়ায়নি। কীর্তিকার কথা শুনে বৃষভানুর মুখখানা মুহূর্তের জন্যে মলিন হয়ে গিয়েছিল। কেমন একটা অসহায লাগছিল। কীর্তিকার অপ্রিয়

সত্যকে গ্রহণ করবার জন্য মন তার প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অপ্রিয় মিথ্যার আঘাতটা ছিল তার অসহনীয়। তাই, বেশ খানিকটা বিচলিত আর অস্থির হয়ে বলল: তোমার যা ইচ্ছে কর, আমি এই সম্বন্ধের মধ্যে নেই।

বৃষভানু খুব উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিপন্ন মুখে অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে রাধা কীর্তিকার দিকে তাকিয়েছিল। অতীতকালের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে রূপ দেবার ভাষা তার নেই। কেবল তার চল্লিশ বছর তখন বারো বছরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

রাজার কন্যা সে। তার কোন দুঃখ নেই, দৈন্য নেই। কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ আর একা। বয়স তাকে কাঙাল করেছিল, লোভী করেছিল। অজ্ঞাত, অপরিচিত, সুদর্শন যুবা পুরুষ আয়ান তার সমস্ত অনুভূতিকে, চেতনাকে কী এক দুরন্ত মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণের দুরন্ত কৌতূহল যেন তাকে শেখাল কি করে জীবনসত্যকে জানতে হয়। অদেখা আয়ানকে নিয়ে তার অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা তো জীবনলিপ্সা। ঐ বয়সে মেয়েরা একটু বেশি স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। আত্মরতির দহনে তারা রূপ সচেতন ও দেহ সচেতন হয়ে উঠে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাধা নিজেকে দেখত তন্ন তন্ন করে। ঠিক দেখা নয়, নিজেকে আবিষ্কার করা, অনুভব করা। কতখানি মেয়ে হয়ে ওঠেছে দেখার কৌতূহলে বুক থেকে শাড়িটাকে সরিয়ে সদ্যোদ্ভিন্ন মুকুলিত বুকের দিকে কী গভীর বিস্ময় নিয়ে তাকাত! আর মনের ভিতরটা এক অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হত। মাঝে মাঝে কী এক অদ্ভুত খেয়ালে পয়োধরের উচ্চতা ও পরিধির পরিমাপ করত। কখনও ভুরু কুঁচকে আড়চোখে কটাক্ষ হানত আয়নায়।

তাকে সাজলে কত সুন্দর দেখায় তা দেখার জন্যে রাধা নীলাম্বরী শাড়ি পরে, হাতে গলায় কানে গয়না, পায়ে নূপুর

মাথায় টায়রা দিয়ে বধূ বেশ করত। কীর্তিকার সুন্দর টায়রার ওপর তার খুব লোভ ছিল। লুকিয়ে পরত। সামনে চুলের দু'পাশ দিয়ে দুটো হার যেত, আর সিঁথির উপর যে লকেটটা ছিল তা কপালের মাঝখানে ঝুলত। ভীষণ সুন্দর লাগত। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে রাধা বউ হত। অমনি কেমন একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে তার বুকের ভেতরটা শির শির করে ওঠত। রাধা অবাক হয়ে যেত। শুধু মাথায় একটা ঘোমটা দিলে অল্প সময়ের ভিতর অনুভূতিটা এমন বদলে যায় কেন? বধূ হওয়ার সুখ কি? কথাটা মনের ভিতর ঘুরত একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে যার নাম সঙ্গীহীনতার যন্ত্রণা।

রাধার অনুভূতির জগৎ জানার সীমা প্রতিদিন বদলে যেতে লাগল। একদিন যেটাকে অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য বলে জানল পরের দিনই সেইটাকে পরম ভ্রান্তি মেনে নিতে হল। হয়ত এমন না হলে সকলের জীবন ও জানা এক নিশ্চল স্থির বিন্দুতে স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।



অন্ধকারের ভিতর থেকেই দ্বাদশ [illegible] বেরিয়ে এল। বিদ্যুৎ বয়ে গেল রাধার শরীর ও মনের ভিতর। কি করে যে সম্ভব হল এটা রাধা ভেবে পেল না। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎটাকে সে চেনে, তা তো কালেব দ্বারা খণ্ডিত। তার বাইবে পা দিয়ে জীবনকে কখনো দেখেনি। দেখার সাহস হয়নি। আজ হঠাৎ কোথা থেকে এক তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি উঠে এসে সব. গণ্ডোগোল পাকিয়ে দিল। খণ্ডিত কালের গণ্ডী ভেঙ্গে মনটা প্রসারিত হয়ে গেল তার শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে। নিজেকে কাল থেকে কালান্তরের মধ্যে প্রসারিত করে দিল রাধা। তার মন থেমে ছিল না। অন্তহীন কালচক্রেব মধ্যে পরিভ্রমণ করছিল। বারে

বাবে তাই, কখনো দিনে, কখনো রাতে সে ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছিল। কখনও আভীর পল্লীতে, কখনও বৃন্দাবনে, কখনও গোকুলে।

ঘটা করে কৃষ্ণের জন্মদিন হচ্ছে গোকুলে, কৃষ্ণ পাঁচ বছর পূর্ণ করে ছয় বছরে পড়েছে। ঐ বয়সে কৃষ্ণ এক অসাধারণ মানব, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কৃষ্ণকে নিয়ে। সত্যিই সে গোকুলবাসীর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। রাধা তাকে শিশু অবস্থায় দেখেছে। তাকে দেখলে সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাপ্তির আনন্দে মন ভরে যায়।

কৃষ্ণের জন্মদিনে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। লোকজনে ভরে গেছে নন্দের গৃহ।

বৃষভানুরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে বৃষভানু যেতে চায়নি। কীর্তিকা তাকে বোঝাল: কৃষ্ণকে তুমি দ্যাখনি। চোখ জুড়োনো রূপ তার। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। মনটা কানায় কানায় ভরে যায়। তার সান্নিধ্যের আস্বাদই মধুর। সে এক অসাধারণ মানবশিশু।

বৃষভানু হাঁ-না কোন জবাব দেয়নি। শুধু কীর্তিকাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সপরিবারে গোকুলে যাত্রা করল।

সাঁ সাঁ কবে বাতাস কেটে রথ ছুটছে। রাধার চোখে মুখে বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। মাঝে মাঝে মুখের উপর চুল পড়ছে। পথের চলমান শোভার দিকে তাকিয়ে রাধা চুপ করে বসেছিল রথে। দৃষ্টি শূন্য। মন উদাস। স্বপ্নের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন। বহু দৃশ্য এবং অনুভূতি তার মনেব ভিতরে যা কিছু ক্রিয়া করছিল তা অন্য কেউ জানতে পারল না।

বৃষভানু অনেকক্ষণ ধরে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি, থমথমে ভার মুখ, উদাস অন্যমনস্কতার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল: আজ কৃষ্ণের জন্মদিন। পাঁচ বছর আগে দিনটা ছিল অন্যরকম। সেদিনের ঝড় জলের প্লাবনের ভয়ংকর স্মৃতিটা

মানুষ ভুলতে পারেনি। বোধ হয় কোনোদিন তাদের মন থেকে মুছবে না। আচার্য গর্গও চান না। তিথি নক্ষত্রের কারণে দিনটি নাকি খুবই শুভ। একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণের জন্ম। যার শুভফল নাকি ইতিমধ্যে ফলতে শুরু হয়েছে।

রাধা কোন কথা বলল না। অধরে তার মধুর হাসি, চোখে স্নিগ্ধ মায়াবী দৃষ্টি। রথের জানলার উপর মাথা রেখে সে গভীর সুখের আবেশে চোখ বুজল। পুষ্পের মত স্মৃতির সুবাসে মনটা ভরে গেল। গাছ-পালা, পথ-বনভূমি, প্রান্তর সব দ্রুত চোখের ওপর দিয়ে সবে যাচ্ছে। দৃশ্যপট ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে। কিন্তু রাধার স্বপ্নমদির আঁখিতারায় তার কোনো দৃশ্য প্রতিফলিত হচ্ছে না। পাঁচ বছর আগের একটি দৃশ্য সে দেখছে।

আর পাঁচ জন আত্মীয় ও প্রতিবেশীর মত রাধা কীর্তিকার সঙ্গে নবজাতক কৃষ্ণকে দেখতে এসেছিল। তখন তার বয়স সাত বছর। সাত বছরের মেয়ের কতটুকু বা অনুভূতি। তবু প্রথম দর্শনে জাগল আনন্দ। আনন্দে জাগল সুর। বিস্ময় তার কণ্ঠে ছন্দবদ্ধ হল। মিষ্টি গলায় উচ্চারণ করল.

এ হেন পুত্তলী   বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল   করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ।।

রাধার কথা শুনে ঘরশুদ্ধ লোক তো অবাক। বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তারা তাকে দেখতে লাগল। অনেকগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে এভাবে বসে থাকতে সে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। তার ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

সন্দীপন মুনির বৃদ্ধা জননী পৌর্ণমাসী বিভোল দুই চোখে রাধার দিকে নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। দু চোখের তাবা দুটি মমতায় নিবিড় হল তার। টিকল চিবুক আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে ছুঁয়ে একটু নাড়ল, আদর করে গালে ঠোনা দিয়ে বলল:

এ যে দেখি, নব গোরচনে জিনিয়া বরণ তপত
কাঞ্চন গোরি
ইন্দিবর নিন্দিত, নয়নে অসীম আকাশ সুষমা,
পরণে নীলাম্বরী।

যশোদা তাকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে গাল টিপে ধরে আদর করল বলল: আহা রে, মধুর তুয়া রূপ। বাঁশীর মত তোর কণ্ঠস্বর! কি নাম রে তোর?

রাধা কিছু বলবার আগে কীর্তিকা বলল: আমরা রেখেছি রাধা।

বালিকা হলেও রূপের প্রশংসা রাধার মনকে ছুঁয়ে গেল। কিন্তু এই আশ্চর্য ভাল লাগার উৎস তেত্রিশ বছর পব তার শান্ত স্রোতহীন স্থির জীবনের মাঝখানে একটা লোষ্ট্রপাত করে যে তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করল তার ঢেউ এই মুহূর্তে বাঁশীর মত সমগ্র অনুভূতিতে লেগে রইল। পুলকিত শিহরণের রেশটুকু এমন করে আগে কখনও হৃদয় রাঙিয়ে দেয়নি। রাধা সেই অতীতকে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছে।

নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে মরকত মঞ্জুলকান্তি শিশুর দিকে। কেমন একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণালবৃন্তের মত সুডৌল সুকোমল দুটি ছোট হাত মেলে ধরল। যশোদা নবজাতককে তার কোলে তুলে দিল।।

আকাশ যেমন তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে, মৃণাল যেমন তাকিয়ে থাকে চাঁদের দিকে, তের্মান রাধা নন্দের নন্দন চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। নবজাতকেরও চোখ মুখ মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হল। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা রাধার। এক অবাক মুগ্ধতা ছুঁয়ে গেল রাধাকে। এক মোহিনী মাযায় বুকের ভিতরটা শির্‌শিব্ কবে ওঠল। চোখ বুজে গেল। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মুখখানা নবজাতকের মুখের কাছে নেমে এল। মনে মনে বলল· তুমি মধু, তুমি মধুব। আমার পরাণ বঁধূ।

তার কাণ্ড দেখে যশোদা কীর্তিকার দিকে তাকিয়ে মিট্ মিট্ করে হাসল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল:

তোর দেখি, বিজুরি উজোর অঙ্গ।
আর আমার নন্দন এটি নব জলধর।
কাকে ছেড়ে কার পানে তাকাবো?

পাঁচ বছর আগে দেখা শিশু কৃষ্ণের মুখখানা ভাল করে মনে পড়ে না রাধার। অনেকদিন হয়ে গেছে। তবু, অনেক কথাই তার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। উন্মুখ মনটা সময়ের স্রোত পেরিয়ে আঠাশ বছর আগের এক স্মৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করল।

রথের জানলায় মাথা রেখে সে বাইরের প্রকৃতি দেখছিল। চলমান দৃশ্য দেখতে দেখতে কখন যে কৃষ্ণের শৈশবচিন্তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হল, জানতেও পারল না। পুতনা কৃষ্ণকে স্তন দিচ্ছে। কৃষ্ণ পয়োধরে মুখ দিচ্ছে না, স্তনবৃন্ত নিয়ে খেলা করছে। খেলাতে মেতে গিয়ে কৃষ্ণ পুতনার গালের মধ্যে হঠাৎ তার হাতখানা পুরে দেয়। পুতনা আর্তনাদ করে ঢলে পড়ে মাটিতে। আর উঠে না। এর কিছুকাল পরের একটা ঘটনা রাধার মনে ভীড় করে। কৃষ্ণ আঙিনায় খেলা করছে। হঠাৎ কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে যশোদা পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দেখে একটা শকট ভেঙে পড়ে আছে কৃষ্ণের পাশে। কংসের বিশ্বস্ত অনুচর তৃণাবর্ত চুপিচুপি কৃষ্ণকে হরণ করে নিয়ে আকাশপথে পালাচ্ছিল। অলৌকিক শক্তিবলে শিশু কৃষ্ণ তার ক্ষুদ্র দেহকে এমন ভারী করে ফেলল যে তৃণাবর্ত তার ভার সইতে না পেরে মাটিতে পড়ে প্রাণ হারাল। ক্রীড়াচ্ছলে তিন বছরের কৃষ্ণ এক বিশাল অর্জুনবৃক্ষ ধাক্কা দিয়ে উপড়ে ফেলল। এমন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প মেঘের মত তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। কিন্তু এই সব গল্প কতটা সত্য আর কতটা বানানো তাই নিয়ে রাধার মনে নানারকম প্রশ্নের উদয় হল।

আঠাশ বছব আগের কথা। তবু কি বিস্ময় মনের মধ্যে এখনও তার অস্তিত্বের সুখকর স্পর্শ লেগে আছে। কিন্তু কেন? একি তবে ভালবাসা? আঠাশ বছর পর এই প্রশ্নটা তার অনুভূতিতে যন্ত্রণার মত ছড়িয়ে পড়ল। এক অদৃশ্য হাত গোপনে বারো বছর বয়সে কেন, তারও আগে কৃষ্ণের সঙ্গে তাব মনকে গেঁথেছিল; কালের অবগুণ্ঠন খুলে দেখা হয়নি সে হৃদয় রহস্য। তেত্রিশ বছর পর মধ্যরাতের বাঁশি হঠাৎ তার অবগুণ্ঠন খুলল কেন? এতকাল পরে এমন করে সব মনে আসতে পারে? পুরনো স্মৃতিকথায় এত রক্তক্ষরণ হয়?

নিস্তব্ধ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধার মনে হতে লাগল, বাঁশিব সুরের মত সেও আকাশে ভেসে কোথায় চলে যায়। চাঁদেব দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে, "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে।" কেন যে কথাগুলো তার মনের মধ্যে নীরব ঝংকারে বেজে উঠল নিজেও জানে না। কিন্তু অনুভূতির গভীরে এই সুর তাব গুনগুন করছিল। মনের তারগুলো কে যেন ঐ সুরে বেঁধে দিয়েছিল।

কৃষ্ণের জন্মদিনটা এক আশ্চর্য সুন্দর দিন। উৎসবের সাজ-সজ্জায় গোকুল নগরী ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠেছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া এক চিলতে সরু এবং ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধা উৎসবের জাঁকজমক আমোদ-প্রমোদ হৈ-হুল্লোড় দেখছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছিল। তার সঙ্গ সুখের কথাটা মনে হতেই রাধার গায়ে কাঁটা দিল। পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণের সঙ্গে বারো বছরে রাধার সম্পর্ক কি? আর পাঁচটা বালকের মত তার দুষ্টুমি, ছেলেমানুষীতে কি আর মন স্পর্শ করে? পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণের চুম্বনে কখনও তার দেহের শুচিতা যায় না। তার দেহস্পর্শে লজ্জাই বা হবে কেন? লজ্জা হয়েছিল এই জন্যেই যে, বয়স্করা তাদের নিয়ে কৌতুক করছিল। বারোবছর বয়সের সব মেয়েই সে কৌতুকের মর্ম ও

ইংগিত বোঝে। কিন্তু একটা পাঁচ বছরের বালকের সঙ্গে এরূপ একটা সম্পর্কের কল্পনা তার শরীরের ভিতর একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ দিয়ে গিয়েছিল। অনাগত কালের এক তরুণ কৃষ্ণের কাল্পনিক রূপ চিন্তা করে যে শিহরণ শরীরেব কোষে কোষে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল তার অনুভূতি মনেতে লেগে আছে এখনও। তরুণ কৃষ্ণের নীল-নবঘন আষাঢ় গগনেব মত অনুপম রূপ, শস্যক্ষেত্রের মত লাবণ্যদীপ্ত শবীর, মৃগের মত দীঘল কালো চোখে প্রেমের মদিরা—সে শুধু প্রেম চায়, প্রেমে পাগল হতে চায়, এমন আশ্চর্য, সত্যি মানুষ স্বপ্ন ছাড়া হয় না। সত্যি বলে বিশ্বাস করতে তাব বুক কেঁপে ওঠে। চল্লিশ বছরের রাধা আজ খোলা চোখে স্থির দৃষ্টিতে সেই স্বপ্নেব কৃষ্ণকে দেখছে। কিন্তু সে পাঁচ বছরের কৃষ্ণ নয়। স্মৃতির অবচেতনেব গভীর যাকে নির্বাসন দিয়েছিল তাকে টেনে আনল মনের মণিকোঠায়।

রাধা তার বারো বছর বয়সে অনুপ্রবিষ্ট—তার সামনে কিংবা পিছনে নেই। ধ্রুবতারার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই চল্লিশ বছরে পা রেখেও বারো বছর বয়স সীমায়।

বারো বছরের মেয়ে এমন কিছু ছোট নয়। যৌবনের ঢল নেমেছে শরীর জুড়ে। কিন্তু সে যে পাঁচ বছরের বালক কৃষ্ণেব ভিতর ঘুমন্ত পুরুষকে অকালে যুগান্তরের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে ভাবতে পারেনি। তাই নির্ভয়ে কৃষ্ণকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। অনুগত ও বাধ্য ছেলের মত কৃষ্ণ তার কোলে এসে বসল। তার ফর্সা সুন্দর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ রাধার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। আদর করল। রাঙা গালের ওপর ঠোনা দিল। অবশেষে কি ভেবে চুক করে একটা চুমু দিয়ে দুষ্টু ছেলের মত খিল খিল করে হেসে ওঠল। এক ঘর লোকের মধ্যে এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে কৃষ্ণ তাকে যতটা অপদস্থ করেছিল তার চেয়ে বেশী লজ্জায় ফেলেছিল। ভীষণ রাগ হল কৃষ্ণের ওপর। তার কান ঝাঁ ঝাঁ

করতে লাগল। বুকের ভিতব ধক্ ধক্ করছিল। পুরুষ ও মহিলারা নানারকম টিপ্পনি কাটল। অপরিণত দুটি বালক-বালিকাকে নিয়ে বয়স্কদের মস্করা রাধার ভাল লাগল না। সহ্য করতে পাবল না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার। লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে তার চোখ ফেটে জল বেরোল। কারো চোখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না। দুঃখটা বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠল। রাধা মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে বৃষভানুর সঙ্গে রাধা আচার্য গর্গকে প্রণাম করতে এল। বুকে তার প্রগাঢ় ভক্তি। কিন্তু কেমন একটা লজ্জায় ওঁর চোখের দিকে ভাল করে তাকানোর তার সাহস হল না। খুব ভয়ে ভয়ে গর্গের পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল। গর্গ মাথায় তাঁর অভয় হস্ত রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগল: প্রিয়দর্শিনী রাধা তোমার বয়স অল্প। কৃষ্ণের ছেলেমানুষী নিয়ে বয়স্ক লোকেরা যে কাণ্ডটা করল তাতে আমিও মর্মাহত। যাই হোক, মনটাকে অস্থির কর না। নিজেকে শান্ত রাখ। মনটা দর্পণের মত স্বচ্ছ, আর আকাশের মত নির্মল রাখ। মনকে বাইরের ঘটনায় কখনও চঞ্চল হতে দিও না। আকাশে মেঘ জমে, বজ্রপাত হয়- -কিন্তু আকাশে তার কোন ছাপ থাকে না। মনে বাইরের নানা ঘটনার ছায়া পড়বে আকাশের মত সহজভাবে তা গ্রহণ কর, কিন্তু কখনও নীল সমুদ্রের মত তাকে অশান্ত উত্তাল করে তোলার দরকার নেই—শান্ত হয়ে থেক। তোমার নিজের ভিতর যে মাধুরীলতা আছে তার ডালে ডালে ফুল ফুটবে। শুধু অপেক্ষা কর।

নম্র আবেগে কেঁপে গেল রাধার বুকের ভিতরটা। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীববতা। যা কৃতজ্ঞতার আবেগে বিগলিত কবে তাব মুখ।

আঠাশ বছর পরে রাধা গর্গের সেই সুধাস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শুনল হৃদয়েব অভ্যন্তরে। গর্গেব ফর্সা গলার উপর সেই অদৃশ্য

মালার সুগন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছে। আজ এই মুহূর্তে প্রথম সাহস করে কল্পনায় রাধা গর্গের দিকে চেয়ে রইল। কী অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব! সেই ব্যাক্তিত্বের আকর্ষণীয় শক্তি কত প্রবল আর গভীর! অমন দেশপ্রাণ, স্নেহপ্রবণ, মধুর স্বভাবের মানুষ হয় না বললেই চলে। বাইরে থেকে তাঁকে খুব গম্ভীর, দাম্ভিক এবং কড়া মেজাজের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্যে এতটুকু অবজ্ঞা নেই। গোকুলে, বৃন্দাবনে মথুরায় সবাই তাঁকে মান্য করে, ভালবাসে। শ্রদ্ধাও আনুগত্য তিনি আদায় করে নিতে জানেন। গর্গ সম্পূর্ণ দোষশূন্য এবং দেবতাতুল্য এক মানুষ, এরকম একটা ধারণা নিয়ে সেদিন গোকুল থেকে প্রত্যাবর্তন করল।



দিনগুলো গড়িয়ে চলে সকাল থেকে সন্ধ্যে। তার ভেতর কোন বৈচিত্র্য নেই। সমারোহ নেই। খালি পুনরাবৃত্তি।

রাত্রি গভীর হচ্ছে। শুক্লাদশমীর চাঁদ বিদায় নিয়েছে। এখন

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাঁশীর মিষ্টি সুরে রাধার ভিতরটা যেন মোমের মত গলে গলে পড়ছে। কে যেন আকুল সুরে তাকে · ডাকছে। "বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা"। ঐ সুরের মধ্যে কৃষ্ণের অস্তিত্বের খবর ভেসে আসছে। রাধার শরীরের ভিতরটা গরম হয়ে ওঠল। চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল। শৌচঘরে গিয়ে চোখে মুখে ভাল করে জল দিল। তারপর দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে নিজের পালঙ্কে গিয়ে শুল।

প্রদীপের মৃদু আলো পড়েছে ঘুমন্ত আয়ানের মুখে। রাধা বেশ কিছুক্ষণ আয়ানের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বুকের মধ্য থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল 'বেচারা'! সারাটা জীবন তার কোন সাধ বাসনাই পূর্ণ হয়নি। বেচারা কত চায় তাকে, তবু কয়েকটা দণ্ডের বেশি তার কাছে থাকেনি কোনদিন। আয়ানের সম্বন্ধে তার ভয়টা কেটে গেছে। তবু মনটা আজও তাকে মানিয়ে নিতে পারেনি। এখনও বিষাদে ছেয়ে আছে।

চল্লিশ বছর বয়সে যখন আবার বারো বছরের জীবনে প্রবেশ করল তখন আবার ঠিক সেই বারো বছর বয়সে ফুলশয্যার রাতের অনুভূতিটা ফিরে পেল রাধা। ফুল ও চন্দনের সুবাস যেন এখনও তার নিঃশ্বাসে লেগে আছে। বুকের ভিতরটা তাব মোচড় দিল। কি যেন শির্ শির্ করে গেল সারা শরীর জুড়ে। এই চল্লিশ বছর বয়সেও সত্তার একটা অংশ এখনো বারো বছর বয়সের অনুভূতিতে ও অভিজ্ঞতায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শরীর নেই, কিন্তু সত্ত্বা আছে, রাধাও আছে। কেবল কালের দুই তীরে সে স্থির দাঁড়িয়ে।

কথাটা কিছুক্ষণ ধরে রাধার মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে। মনের কষ্টের সঙ্গে শরীরের অব্যক্ত যন্ত্রণাও যোগ হল। প্রতিদিন জননী কীর্তিকার অপমানকর ও অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটে প্রতিবেশীদের কাছে। বিশেষত বাইরের লোকে রাধার বয়স আর রূপ নিয়ে

বেশি সমালোচনা এবং নিন্দে করে। নিন্দে, সমালোচনার কেন্দ্র বৃষভানু। কীর্তিকাকে প্রতিদিন শুনতেও হয়, সহ্য করতেও হয়। কিন্তু রাধা জানে পিতা তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই বিয়েটা শুধু বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। ওকেই কীর্তিকা বৃষভানুর অজুহাত এবং ওজর আপত্তি বলে ভাবে। স্বামীকে কেউ অপমান করুক কোন মেয়েমানুষ সইতে পারে না। কীর্তিকা বৃষভানুর মান বাঁচাতে ওঠে পড়ে লাগল আয়ানের সঙ্গে রাধার বিয়েটা তাড়াতাড়ি করতে।

পিতাব অনিচ্ছাকে জননী প্রতিদিন আঘাত করে, নানা অসম্মানজনক কথা বলে। অপদস্থ করে। এসব রাধার মোটেই ভাল লাগে না। জননীব জুলুমে সে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। নিজেকে তার এই সংসারে এক অবাঞ্ছিত মনে হত। তার অস্তিত্ব সংসারে যেন বিষ হয়ে ওঠছে। তার নিজেরও সংসাবেব প্রতি একটুও টান নেই। আর এক মুহূর্ত থাকতে তার ইচ্ছে কবে না। মনের ভিতরও একটা ভিন্ন স্রোত বইতে আরম্ভ কবেছিল। এটা তার ঘর নয়। এ সংসারে সে কেউ নয়। দুদিনেব অতিথি মাত্র। স্বামীর ঘর তার নিজের ঘর, নিজের বাড়ী। সেটাই তাব পৃথিবী, তার স্বর্গ। বাইরে থেকে কেউ তাব মনেব খবব টেব পেল না। কিন্তু মনে প্রাণে সে বৃন্দাবন থেকে পালাতে চাইছিল। আয়ান ছিল তার দিনের ভাবনা, রাতের স্বপ্ন। কল্পনায আয়ান সম্বন্ধে কত কি ভাবত। বিয়ে হলে স্বাধীন হবে। নিষেধেব বেড়ি ভাঙবে। ইচ্ছামত প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে মিশতে পারবে। সন্দেহের যন্ত্রণা থাকবে না।

রাধার মনের কামনায় স্বপ্নের খাদ ছিল বেশি। তাই বিয়ের রাতেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। নিদারুণ মর্ম যন্ত্রণায় তার সব এলোমেলো হয়ে গেল। বারো বছর বয়সেই তার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। কামনা, বাসনা, ভালবাসা—এরা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে, কিন্তু সকলে স্বতন্ত্র। বিয়ের পর এদেব পার্থক্য অনুভব করল সে। ভালবাসা হল শতদল। জীবনকে

শুধু মেলে ধরে, শতদলের মত ফুটিয়ে তোলে, সেখানে মধুকরের নিত্য নিমন্ত্রণ। আর বাসনা হল তার মৃণালদন্ড, কামনা হল কাঁটা—যন্ত্রণা দেয়, বিদ্ধ করে। কমল ভ্রমে সে মৃণাল ধরেছে। তাই তার ভালবাসায় এত দুঃখ আর জ্বালা। এজন্যে মা-কেই দায়ী করে।

বিয়ের পিঁড়িতে দুজন মুখোমুখি বসেছে। আয়ানের করপদ্মের ওপর তার করপদ্ম সংস্থাপিত। সারা শরীরে যেন কিসের দামামা বেজে যাচ্ছে। বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ কোলাহল ভেদ করে মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। জয়ধ্বনির মত সে মন্ত্র তাকে অভিভূত করছে। নতুন জীবন অভিষেকের মন্ত্র যেন তাকে অভিষিক্ত করতে থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। মন্ত্রেব কোন অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু তার বিচিত্র সুর ও ধ্বনি তার সমস্ত মনকে টানছিল।

হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মনিবেদনের ভাব টৈটুম্বুর হয়ে গেল। মনে মনে বলছিল—

ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।

মনের মধ্যে ঐ ভাবটা তাকে কেমন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল।

অগ্নি সাক্ষীর সময় আযান যখন তার হাত দিয়ে একটি একটি করে খই আহুতি দিল অগ্নিতে তখন কেমন চোখ ফেটে তার জল বেরোল। অবিশ্রান্ত কাঁদছিল। কিন্তু কিছুতেই সমবরণ করতে পারছিল না নিজেকে। কেন কাঁদছিল নিজেই জানে না। বৃন্দে কানে কানে বলল: "এত যদি কান্না তোর, দরকার নেই বিয়ের, তোর জায়গায় না হয় আমি বসে যাচ্ছি।" বৃন্দের কথাটা কিন্তু মোটেই ভাল লাগিনি তার। বরং মনে হল, বৃন্দে ঈর্ষা করে কথাগুলো বলছে। কিন্তু তবু কাঁদছিল সে। কেন কাঁদছিল কে জানে? পতিগৃহে যাত্রাকালে সব মেয়েই কাঁদে।

বাবা মা প্রিয়-জনকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য যত তারা কাঁদে তার চেয়ে বেশি কাঁদে একটা নতুন পরিবেশ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা আর ভয় থেকে। কিন্তু অগ্নিসাক্ষীর সময় ওসব কিছু মনে হয়নি তার। বরং উল্টোটা হয়েছিল। মন যেন কিছুই মেনে নিতে পারছিল না। বুকের ভেতর হাহাকার দামামার মত বেজে যাচ্ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। কোথায় যেন তার কি হয়েছিল!

দধিমঙ্গল হয়ে গেল। বর কনে বিয়ের পিঁড়ি থেকে বাসর ঘরে এল। তবু মন শান্ত হল না। অগ্নিসাক্ষীর সময় কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। এরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটল কেন জীবনে—রাধা কিছুই ভেবে পেল না। মনটা কেবল খুঁতখুঁত করতে লাগল।

কান্নার উৎসটা আঠাশ বছর পর আজ অনুভব করল। এই মুহূর্তে সে বারো বছর বয়সে ফিরে এল। সেই সময়ের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ হল চেতনায়। প্রেমের সুতীব্র অনুভূতি তার সমস্ত সত্তায় সত্তায় স্পন্দিত হতে লাগল। সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পেল।

নাটমন্দিরে মালা গাঁথছিল সে। হঠাৎ বেজে উঠল কনকজিঞ্জির। রাধা মুখ তুলে তাকাল। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল যশোদানন্দন গোপাল। শরীরের মধ্যে তার ঘুঙুর বাজছিল। তার বুকের ভেতর যেন প্রজাপতি পাখা মেলে দিয়েছিল। নীল আকাশ যেন নেমে এসেছিল মাটিতে।

গোপাল তার পাশে চুপটি করে বসল। নির্নিমেষ নয়নে রাধা তার অপরূপ রূপশ্রী দেখতে লাগল। ‘‘পুষ্প-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ায় ঢলনি।’’ রাধার গায়ে কাঁটা দিল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। এই আবেগটা যে কী রাধা সম্যক জানত না। কেবল প্রাণ যেন বিশেষভাবে ভেঙে পড়তে চাইছিল যা প্রায় অসহনীয়। দ্বাদশবর্ষী রাধার বুকের ভেতর দুর্বার তৃষ্ণা জাগল। প্রমত্ত আবেগে পঞ্চবর্ষী গোপালের গালটা টিপে

ধরল। শীরের কোষে কোষে একটা অব্যক্ত সুরের ঝংকার বেজে যাচ্ছিল। একটা আতপ্ত কামনা অনুভূত হয়েছিল প্রতি অঙ্গে। কামনায় যে এত উল্লাস আর যাতনা থাকতে পারে জানা ছিল না। এক অনির্বচনীয় মহিমময় সুখের ভেতর সে হারিয়ে গেল। গভীর আবেগে পঞ্চবর্ষী গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার কচি গালে আগ্রাসী চুমু খেল। এবং সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল দ্বাদশী রাধার স্নেহবৎসল হৃদয়দানের থর থর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রাণপণে গোপালকে জড়িয়ে ধরে আদর করার মধ্যে তার আশ্চর্যরকমভাবে একটি ইন্দ্রিয়সজাগ ছিল। যা দ্বাদশী রাধাকে প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণের মত পঞ্চবর্ষী গোপালের দিকে ধাবিত করেছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, তার শরীর কেমন হাল্কা হয়ে গেল। সে যেন উড়ে যাচ্ছিল শূন্যে। মনময়ূর যেন কি এক পাওয়ার অসীম উল্লাসে নাচছিল।

গোপাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাধার চোখের দিকে তাকিয়েছিল এবং আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটের কোণে একটু অপ্রশস্ত হাসি ফুটেছিল। সে হাসিতে মৃদু লজ্জার আভাস মাখানো। ভুরু কুঁচকে বলেছিল: তুমি ভারি অসভ্য।

রাধার মুখে চোখে আনন্দ বিস্ময় এবং সূক্ষ্ম অপরাধবোধের এক অভিব্যক্তি ফুটেছিল। বলল: বারে, আমার দোষ কি? মোমের পুতুলের মত দেখতে তুমি। এত সুন্দর নাক! দেখলেই বুকের ভেতরটা উথলে ওঠার ভাব হয়। কি করব বল?

তুমিও তো দেখতে কত সুন্দর ! আমার চেয়েও ফর্সা।

যারা হিংসুটে ভগবান তাদের গায়ের রঙ কালো করে দেয়।

ইস্, তোমাকে বলেছে। আমি কালো বলে ত তোমার এত ভাল লাগে।

অবাক মুগ্ধতা নিয়ে রাধা চেয়ে রইল। তার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। কাঁপা গলায় স্খলিত স্বরে প্রশ্ন করল: কেমন করে বুঝলে তুমি?

পিপাসা লাগলে জলেব প্রয়োজন টের পাই। তেমনি

আমার বুকের মধ্যে তোমার হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দ শুনেছি। তুমি চোখ বুজে আমার মুখে মুখ রেখেছ, কিন্তু তোমার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়েছে। মা যখন আদর করে তারও চোখ দিযে এমন জলের ধারা নামে। আর তখন বুঝতে পারি মা আমাকে খুব ভালবাসে। তেমনি করে বুঝেছি তুমি আমাকে ভালবাস।

'মুহূর্তে রাধার অন্তরের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। সে যেন নীল সাগরের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অনুভব করল গোটা পৃথিবীর রংটা তার কাছে বদলে গেছে। এ কি তবে ভালবাসা? একে কি প্রেম বলে? প্রণয়ের কি কোন বয়স নেই?

তখনই এক বুকভাঙা নিঃশ্বাস পড়ল। রাধা চমকে তাকাল সে বৃন্দাবনের নাট-মন্দিরে বসে নেই। আভীর পল্লীর আয়ানের কক্ষে খাটে শুয়ে আছে। এসব চিন্তায় মনটা একবার ছি ছি করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে শরীরের অভ্যন্তরে কোষে কোষে এক অদ্ভুত অনুভূতি ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তার নিজেব সত্তাকে খুঁজতে লাগল। সব ছাপিয়ে ফুলশয্যার রাতের ছবিটা নিদ্রাহীন দুই চোখের তারায় এই মুহূর্তে ভাসতে লাগল।

ননদিনী কুটিলা এবং কিছু মহিলা মিলে স্বামীকে শয়নকক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। আয়ানকে সেই প্রথম দেখল। আয়ানের বয়স বিশ, আর তার বারো। আয়ান আট বছরের বড়। নিটোল সুন্দর আর সুপুরুষ। সুন্দর মুখশ্রী। একান্তই ভাল লোক। বিযের কনের জড়তা আর লজ্জা ছাড়া ভয় ছিল না প্রাণে। তার পরণে ছিল নীলাম্বরী রেশমী শাড়ি। কপালে গালে ছিল কনেচন্দন আর সিঁথিতে সিঁদুর।

পা টিপে টিপে আয়ান পালঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল। শিকারীর মত খুব সন্তর্পণে এবং চতুর্দিকে নজব রেখে যেন এগোচ্ছিল সে। রাধার কেমন একটু ভয় ভয় করল। মানুষটাকে একেবারে চেনা নেই। কেমন হবে, কিরকম ব্যবহাব করবে এসব ভাবনায সে ঘেমে নেয়ে গেল। এর সঙ্গে

রাতে একই বিছনানায় কাটানোর কথা ভেবে লজ্জায় মরে গেল। সারা শরীরের ভেতর শির শির করে উঠল। অথচ মা তাকে বার বার বলেছে, স্বামীর কথা শুনতে হয়। সে যা চায় তাতে বাধা দিতে নেই, আপত্তি করতেও নেই। স্বামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বর সেবায় কোন ত্রুটি হলে মেয়েমানুষের নরকেও স্থান হয় না। কিন্তু এসব কথার অর্থ তার জানা ছিল না। কিন্তু আয়ান যখন তার কাছে দাঁড়াল তখন বুকটা তার ধড়াস, ধড়াস, করে উঠল। কেমন একটা ভয় ও ভাবনায় বিব্রত বোধ করতে লাগল।

আয়ানের দুই ঠোঁটে টেপা হাসি। একটা অদ্ভুত আবেগে তার মুখ জ্বলজ্বল করছিল। রাধা তার অভিব্যক্তি দেখেই টের পেয়েছিল আয়ানের অভ্যন্তরটা যেন দুরন্ত অস্থিরতায় পাখা ঝাপ্টাচ্ছিল, কিন্তু সে নিজে নিস্পন্দ, স্থির। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছিল। আসলে লজ্জায়, ভয়ে, আতঙ্কে তার নিজেরই শরীবের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন। একটা কল্পিত ভয়ে তার বুকের ভিতরটা টাটাচ্ছিল। চোখ কেমন ছলছলিয়ে উঠেছিল।

সময়ের গতি তখন দুরন্ত। আয়ান তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। কাঁধ স্পর্শ করল। চকিত শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেল সারা অঙ্গে। উদ্‌গত নিঃশ্বাস তার বুকের খাঁচায় আটকে গেল। তীব্র ব্যথায় টাটিয়ে উঠল। প্রায় কান্নার আবেগে বলল· না, না, আমাকে ছুঁয়ো না। ছেড়ে দাও। আমার ভয় করছে।

আয়ান থমকে গেল। চকিতে শীর্ণ হল তার আবেগ। শিথিল হল বাহু। কিন্তু নিমেষ কাটতে না কাটতে আযান তার শরীর ধরে প্রচন্ড ঝাপ্টায় নাড়া দিল। সমস্ত মুখখানা তার লালায় ভিজিয়ে দিল।

আয়ান তাকে বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত করছিল, সে শব্দ করে কেঁদে ওঠল। আয়ান কথা খুঁজে পেল না। অসহায় বোধ করে কেবল ডাকল: রাধা—এই—এই শোন।

এক দুরন্ত আক্ষেপে তার সমস্ত শরীর পাক দিয়ে মুচড়ে

উঠেছিল। আর সে কান্নার শব্দকে আয়ানের বুকে চেপে ধরেছিল। কান্না জড়ানো অস্ফুটস্বরে শুধু, বলল· আমাকে ছেড়ে দাও—

আয়ানের কথার কোন জবাব শোনা গেল না। অপ্রস্তুতের মত তাকে বুকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। পালঙ্কের ওপর বসল। তারপর মুখের খুব কাছে মুখ এনে আয়ান তার চোখের 'জল, আর বন্ধ শক্ত ঠোঁটের কষে গড়ানো লালায় ভেজা মুখখানা দেখল। খুব আস্তে আস্তে তার গালে হাত দিল। ভেজা চোখের জল আর লালা মুছিয়ে দিল। শিশুর মত ভয় ও কান্নায় তার গলাটা ধরে গেল! অস্ফুট স্বরে নিজেকে ধিক্কার দিল বলল: ছিঃ। ভীষণ অন্যায় করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

আক্ষেপে আবর্তিত শরীর সহসা রাধার স্থির হয়ে গেল। গলা থেকে স্খলিত হল একটা স্বর: আমার কেন যে ভীষণ ভয়! কথাটা শেষ করতে পারল না।

এই ঘটনার পর কথা বলার আর কিছু খুঁজে পেল না তারা। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আয়ানের দিকে পিছন ফিরে শুল।

আঠাশ বছর আগের দৃশ্য দেখছিল রাধা। দৃশ্যগুলো পর পর তার মনে আসছে কি-না জানে না। তবে সে বর্তমানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যা যা ভাবছিল তার অতীতও নেই বর্তমানও নেই, তার আগে পরে কিছু নেই। শুধু বাঁশীর সুর তাকে স্পর্শ করে আছে। আর সে ক্ষণে ক্ষণে প্রবিষ্ট হচ্ছে তার বারো বছরের জীবনে।

আশাভঙ্গে ছাই হয়ে গিয়ে আয়ান বলল: যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা সুরু সেদিন থেকেই মনে কেমন একটা অনুরাগ আর ভালবাসা জন্মেছিল। তোমাকে নিয়েই আমার পৃথিবী তখন। কল্পনায় কত প্রেম মান অভিমান করেছি তোমার সঙ্গে। শুভদৃষ্টির সময় তোমাকে প্রথম দেখলাম। মনে মনে বললাম: আমার জীবন সর্বস্ব।

আমার সব কিছু তোমাকে দিলাম। তুমি আমার সুখ-দুঃখ, আমার জীবন-মরণ, আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব। কথাগুলো বলার সময় এক গভীর ভালবাসায় আয়ানের গলার স্বর বুজে গিয়েছিল। গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছিল।

আয়ানের কথাগুলো তার অন্তর ছুঁয়েছিল। তার ইচ্ছে করেছিল আয়ানকে বলতে— প্রিযতম কল্পনায় আমিও তোমাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছি। আমার হৃদয়কে নৈবেদ্য দিযেছি প্রতিদিন। কথাগুলো তার বুকেব ভিতর তোলপাড় করেছিল কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বেরোল না। নিজের কাছেই কেবল সংগোপনে বলেছিল ভালবেসে কিছু চাওয়া, আর ডাকাতি করা কি এক হল? তুমি ডাকাতি করতে এসেছ।

আয়ানের কোন কথার সে জবাব দেযনি। বেশ বুঝতে পারছিল আয়ানের মধ্যে কেমন একটা অপরাধবোধ ও পাপবোধ কাজ করছিল। আয়ান শয্যা থেকে উঠে জানলাব কাছে গিযে দাঁড়াল। তার চোখ উপবাসী ভিখারীর তীব্র ক্ষিদেয় জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। আয়ান নিজের মনেই তাকে শুনিয়ে বলল: কোন ইচ্ছে পূরণ করার মধ্যে যেমন তীব্র সুখ থাকে, তেমনি নিজেকে নিবৃত্ত করার মধ্যেও তীব্রতর কোন সুখ চাপা থাকে। একটা অতিরিক্ত স্বাভাবিক ভাবাবেগকে গলা টিপে ফেলার নাম বঞ্চনা, ছলনা, জিতেন্দ্রিয়তার ভণ্ডামি।

সময়প্রবাহ থেমে থাকল না। কিন্তু তার মুখে কোন কথা যোগাল না। বড় বড় কথার পাথর চাপিয়ে আয়ান তার আর্ত মনকে আরো ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। কিন্তু আয়ান ভালবাসায় সিঞ্চিত এক জ্বালাধরা অনুভূতিতে ছটফট করছিল। বিরক্ত স্বরেই বলল: নিজের স্ত্রীর কাছে চুপ করে থাকার মত যন্ত্রণা আর কিছু নেই। চোরের মত সময় কাটান অসহ্য। কেন যে মানুষ বিয়ে করে? ভালবাসে? ভালবাসা বোকামি। বোকারা

আর কাপুরুষেরা ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামায়। সাহসী মানুষরা এসব পরোয়া করে না। আমি দুর্বল, ভীরু বলেই ভালবাসি। ভালবাসার মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই। কিন্তু একজনের যদি পছন্দ না হয় তাহলে মনে করব সে আমার দুর্ভাগ্য।

আয়ানের কথাগুলো শুনে কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মনে মনে তার ভীষণ অসহায় লাগছিল। কিন্তু আবার একটা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতিতে মনটা তার ছেয়ে গেল। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে সে চেয়েছিল আয়ানের দিকে।

আয়ান জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের দিকে মুখ করে থাকায় কানের দু'পাশের চুলের ওপর আলোর রূপালী রেখার আভাস লেগেছিল। ঘরের মেঝেয় পড়েছিল তার ছায়া। দ্বিধাগ্রস্ত এবং যন্ত্রণায কুঁকড়ে যা ওয়া শরীরের ছায়া।

আয়ানের কষ্টে তার বুকের বরফ নিঃশব্দে গলতে শুরু করেছিল। বেশ কিছু পরে স্বগতোক্তির মত বলেছিল: জীবনের সব কিছুরই মানে আছে, সব ঘটনারই একটা নিয়ম আছে, একটা নির্ধারিত সময় থাকে। কুঁড়ি ধরার, ফুল ফোটার, ফল হয়ে ওঠার এবং তারপর ঝবে পড়ার। পাতা উদ্‌গম হওয়ার মুহূর্তে কুসুম ফোটাতে চাইলেই কি ফোটে?

লাট্টুর মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আয়ান। দু'চোখে তার অভিমান জোনাকির মত জ্বলছিল। আশা ভঙ্গের বেদনায় হতাশ হয়ে বলল: আমার প্রথম যৌবন থেকে একটা মেয়েকে স্বপ্ন দেখে আসছি, কল্পনা করে আসছি, বুকের ভেতরটা তার সুগন্ধে ভরপুর। এই পেতে চাওয়ায়, এই মিলনবাসনা হঠাৎ একদিনের নয়। তোমাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার পরেই আমার সেই দুকুল ছাপানো ভালবাসার পুকুর যদি প্লাবিত হয়, তাহলে অপরাধ কোথায়? তোমাদের এই মেয়েলী লজ্জা আর এই দেবী দেবী ভাব একটা নাটক। নাটক হয় জীবনের টুকরো ঘটনা নিয়ে। বাস্তবের অনেক কিছু তাতে ধরা পড়ে না।

আমার মত একজন রক্ত মাংসের মানুষ তার সবটুকু নিয়ে নাটকের পরিধিতে আঁটে না। নাটকে জীবন কৃত্রিম, তার সবটুকুই অভিনয়, মিথ্যে। কিন্তু জীবন অনেক বড়। জীবনে জীবন যখন যুক্ত হয় তখন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী, প্রেরণায় ও টানে ভালমন্দ, সুশ্রী কুশ্রী সব আসে। ভালবাসা মানেই শরীর। অন্তত পুরুষের ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু শরীর। যাকে ভালবাসি তাকে যদি শরীর দিয়ে বুঝতে না পারলাম, কিসের ভালবাসা? অমন যে জননীর নিষ্পাপ বাৎসল্য তাতেও আলিঙ্গন, চুম্বন, প্রভৃতি শরীরী ব্যাপারগুলো আছে। ছেলেভুলানো কথা দিয়ে শুধু নারী পুরুষের প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা হয় না। কোনো দিন শুনেছ, ধূপ ধুনো দিয়ে ফুল দিয়ে পুজো করার জন্যে কেউ বিয়ে করেছে?

কথাগুলো শেষ করে আয়ান হাঁপাচ্ছিল। জোরে জোরে তার শ্বাস পড়ছিল। অবরুদ্ধ অভিমানে তার ঠোঁট কাঁপছিল। কয়েকবার ঢোক গিলে বলল: যে যার কপাল নিয়ে আসে পৃথিবীতে। অভিযোগ অনুযোগ এসব চলে একমাত্র নিজের মা আর ভগবানের কাছে। আর কে শোনে অরণ্যের রোদন? অন্যের কাছে জানাতে গেলে নিজেকেই ছোট করা হয়। আমার কি দায় পড়ে গেছে তোমার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের কথা বলা, করুণা ভিক্ষা করা। চাইনে চাইনে তোমার ভালবাসা। ব্রজেতে এখনও সুন্দরী মেয়ের অভাব হয়নি।

আয়ানের বুকের ভেতর লাভা স্রোতের মত তার প্রেম টগবগ করে ফুটছিল ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায়, হতাশায় আর নৈরাশ্যের দাহে। এটুকু বুঝেই সে চুপ করেছিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন কথা হয়নি। হঠাৎ রাগ করে একটা চাদর টেনে নিয়ে মেঝেতে গিয়ে শুল সে।

নিস্তব্ধ কক্ষ। দুজনেই নিজের চিন্তায় ও দুঃখে বুঁদ হয়ে রইল। বাইরে চাঁদের আলো বনে এবং পাহাড়ের গভীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। রজনীগন্ধা কনকচাঁপা ফুলের সুগন্ধ নিঃশ্বাস

তাব বুকের ভিতরটা একটা অদ্ভুত মোহ আর আবেগ সঞ্চাব করছিল। মনে হচ্ছিল পুরুষ ও নারী যখন চুপ করে থাকে তখনই তাদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আয়ানের দাপাদাপি এবং রাগের চেয়ে এই বিমুখ বিমর্ষ হয়ে থাকা রূপটাই যেন রাধার কাছে বেশি সুন্দর।

বেশ কিছুক্ষণ পর আয়ানের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হতাশ গলায় বলল: বরফের মত ঠান্ডা তুমি। আজকে সমস্ত সুযোগ ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও তোমাকে পেতে দিলে না আমায়। দুঃখ, তোমাকে আমার করে পেলাম না। তুমি আমার হতে চাইলে না। অথচ, কত স্বপ্ন দেখেছি তোমায়! ফুলের বিছানায় চাঁদের আলোয় শুয়ে রাতভর তোমাকে আদর করছি, সোহাগ জানাচ্ছি, ভালবাসছি—আরো কত কি। তারারা আমাদের প্রেমের সাক্ষী থাকছে, ঝিঁঝিঁরা সঙ্গীত করছে, জোনাকীরা বাসর জাগছে। অপরূপ সে সব স্বপ্ন আমার মাটি হয়ে গেল। কি দোষ করলাম আমি? সহসা আয়ানের কণ্ঠস্বর ভিজে গেল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল: কেন কামনার আগুনে পুড়ে ছাই হতে দিলে না? তোমার কাছে শুধু জ্বালা পেলাম, কিন্তু জ্বলে উঠলাম না। নিজের বুকের আগুনে নিজে জ্বলে মরছি। সবই আমার ভাগ্য! আমার কপালটাই এরকম। মনে মনে তোমাকে ছাড়া আমি দ্বিতীয় মেয়ে কখনও চাইনি। তোমাব মত নিষ্ঠুর মেয়ে পৃথিবীতে খুব কম জন্মায়।

কান্না আর হাসির মাঝামাঝি একরকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে রাধা সহসা ওঠে বসল। আবার, হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তারপর একটু থেমে গম্ভীর গলায় স্বগতোক্তির মত বলল: ভুল কবেছি। দেবীকে মানবী বলে ভুল করেছি। কিন্তু আমি তো চেষ্টা করেও দেবতা হতে পারব না। হতে চাইও না। আমি একজন অতি সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। এসব কথা এড়িয়ে গেলে আমি কেমন করে বাঁচব? কি নিয়ে জীবন কাটাব?

কথাগুলো আয়ানের কণ্ঠে হাহাকারেব মত শোনাল। কষ্টে বুকটা চেপে ধরল। অভিমানের সমুদ্র যেন তার বুকে উথলে ওঠল। গলার স্বরে তার ঢেউ খেলে গেল। বলল: ঠিক আছে। তোমাকে আর আমি কোনদিন চাইব না! আগামীকালের কোন ভরসা বা প্রত্যাশা রাখব না তোমার কাছে। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে আমার যে কল্পনা আর স্বপ্ন রইল তাকে তুমি ফাঁকি দেবে কেমন করে? তুমি আমার কল্পনা কেড়ে নিতে পারবে না। আমার রাতের স্বপ্ন থেকে তুমি পালিয়েও যেতে পারবে না। আমি চাঁদের পানে চেয়ে তোমার মুখ দেখব, আকাশের নীলিমায় তোমার প্রিয় নীলাম্বরী দর্শন করব। আমার ভালবাসার পৃথিবীটাকে শুধু একটু বদলে নিয়ে গ্রহণ করব। এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু সুন্দর পুরুষেরাই বেঁচে থাকে। আমিও বেঁচে থাকব তোমাব শ্রদ্ধার এবং অনুরাগের পাত্র হয়ে। দেহাতীত এক স্বর্গলোক সৃষ্টি করব আমার মনের অভ্যন্তরে। সেখানে তোমার সঙ্গে মনের জানলায় বসে সর্বক্ষণ কথা বলব। অথচ তোমারও সাধ্য নেই আমাকে নিবৃত্ত করার। আয়ানের কথাগুলো রাধার মন ছুঁয়ে গেল। বুকের ভিতর কাঁপুনি সৃষ্টি হল। কিন্তু তবু কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোল না! চুপ করে রইল। কিন্তু তার চোখ দুটি স্থির হয়ে রইল আয়ানের ভেজা দুই চোখের ওপর।

খোলা জানলা দিয়ে আধখানা আকাশ দেখা যাচ্ছিল। শরতের মেঘে মেঘে রাতের খেলা চলছিল। বাইরে শিউলির গন্ধ, আমলকি গাছের পাতারা হাওয়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে; তার মধ্যে একজন চিরন্তন প্রেমিক, অন্যজন চিরন্তন বিরহিনী। আসল ভালবাসা তো একেই বলে! তার ভিতর পুরো আমিটা কোন একজন মানুষের মধ্যে কখনও আটকে থাকে না। সে উপচে যাবে অন্য মানুষের দিকে। এটাইতো শ্রেষ্ঠ ভালবাসার অন্যতম শর্ত।

পরদিন আয়ানের ঘুম ভাঙল রাধার গুনগুন গানের সুরে।

কিন্তু ঘুম থেকে এক নতুন আয়ান জেগে উঠল। এ আয়ান গত রাত্রির নয়। সকালবেলায় নতুন জীবনে জেগে ওঠা আয়ানকে দেখে রাধার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবাক ব্যাপার। আয়ান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওর শুকনো ঠোঁটের সেই আশ্চর্য হাসিতে কৌতুক এবং অশেষ ক্ষমা মাখানো।

সংসারের কিছু লোকের মুখে এক আশ্চর্য তন্ময়তা থাকে। আয়ানের মুখটিও তেমন। তার প্রতি ওর কোন অনুযোগ, অভিযোগ নেই। একেবারেই না। নিজের প্রতিও না। মনটা তার দরদে গলে গেল। চোখ দুটি প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। বলল: অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কি? আমার বুঝি লজ্জা করে না?

আয়ান ধন্য হয়ে গেল। শুধু এই মুখের কথাটায় সে যেন স্বর্গ হাতে পেল। মনে রাখার মত ওর সে অভিব্যক্তি। আনন্দে খুশিতে গম্‌গম্‌ করে ওঠল আয়ানের গলা। বলল: রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

কথাটার অর্থ কতখানি বুঝল সে জানে না, কিন্তু কথার উত্তরটা ঠিক মুখে এল। বলল: আমার মত সত্যি করে কেউই জানে না।

মুহূর্তে আয়ানের মুখের রঙ বদলে গেল। অকস্মাৎ উদাস, অন্যমনস্ক হয়ে গেল তার দুই আঁখি তারা। কেমন গম্ভীর হল তার গলার স্বর। বলল: ঠিক বলেছ, তোমার আশ্চর্য সুন্দর সংযম, স্থৈর্য, নীরবতার বাণী আমার মনের আবরণ খুলে চিনিয়ে দিল আমাকে। তুমি আমার সত্তার ঘুম ভাঙিয়েছ। আমাকে চিনিয়েছ কে আমি? কে তুমি? কোথা থেকে, কেন এলাম আমরা। এসব আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম। সে এক আশ্চর্য কান্ড। শরতের আকাশে তুলোয় পেঁজা সাদা মেঘগুলো হঠাৎ একটা বিরাট রাজহাঁস হয়ে গেল। আমি সেই রাজহাঁসের পিঠে চড়ে স্বর্গে চলেছি। স্বর্গের কাছে পৌঁছতে দরজা বন্ধ হয়ে

গেল। অপমানে সেখানে বসেই ধ্যান করতে লাগলাম। কতকাল যে তপস্যায় কেটে গেল জানি না। ঋষির মত আমার কেশ দাড়ি গোঁফ সব শুভ্র। আমার সারা অঙ্গ দিয়ে এক অদ্ভুত জ্যোতি ঠিকরে বেরোতে লাগল। বলল, ঋষিবর আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও। তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।

বিষ্ণুর কথা শুনে ঋষি হাসল। চোখে তার কৌতুক, মুখে মুক্তার মত বিনয়ী হাসি। বিষ্ণুর দানের ক্ষমতা পরিমাপ করার দুর্মতি হল ঋষির। ঋষি ভাবল সব কিছুর ভাগ দেয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীর ভাগ বা অধিকার কাউকে দেয়া যায় না। বিষ্ণুর সেই কোমল জায়গায় আঘাত করে তাকে সত্যভঙ্গ করার প্রবল ইচ্ছা হল ঋষির। বলল: হে দেব সত্যিই যদি আমার তপস্যায় তোমাকে তুষ্ট করে থাকি, তা হলে তোমার লক্ষ্মীর প্রণয় ভাগ দাও আমাকে।

বিষ্ণুর অধরে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি ফুটল। মৃদু কণ্ঠে বলল: তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে লক্ষ্মী। মর্তভূমিতে লক্ষ্মীর প্রণয় ভাগ পাবে। কিন্তু নব নব দুঃখও সইতে হবে তোমাকে।

এই কথা বলে বিষ্ণু অন্তর্হিত হল। হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল ঝড় ধেয়ে এল। নিমেষে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। শূন্যলোকে ভাসতে ভাসতে আমি চলেছি। তারপর দেখলাম আমার চিরপরিচিত আভীর পল্লীতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখন আমার ঋষির চুল দাড়ি গোঁফ আর নেই। পরিচ্ছন্ন বেশবাস করে বিয়ে কবতে যাচ্ছি। শুভ দৃষ্টির সময বিষ্ণুর লক্ষ্মী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। একসময় সে মুখখানা ধীরে ধীরে তোমার মুখের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর বিষ্ণু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখের পাতা উন্মুক্ত করে যার দেখা পেলাম সে তুমি। লক্ষ্মীর আদল তোমার মুখে।

আয়ানের কথা শুনে রাধা খুব অবাক হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন কথা বলতে পারল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দু'জন দু'জনকে দেখছিল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল বলল: স্বপ্ন! স্বপ! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। যে ভুলতে না পারে, তার মত দুঃখী কেউ হয় না।

মনে আছে, মার উপদেশ মত প্রতিদিন ভোরবেলায় সাবধানে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে রাধা বিছানা থেকে ওঠত। প্রণাম করাটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। প্রণামের সময় মনে হত স্বামীর পায়ের ছোঁয়া পেয়ে সিঁথির সিঁদুর যেন অরুণালোকের উজ্জ্বলতায় জ্বল্‌জ্বল্‌ করে ওঠল। প্রণামের সময় আয়ান জেগে গেল। ত্রাস্ত-ভাবে পা টেনে নিয়ে বলল: ওকি রাধা, করছ কি? আমাকে আব অপরাধী কর না। তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাকে ছোট করার অধিকার তোমার নেই।

আয়ানের কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে চেয়েছিল তার দিকে। দুচোখে তার নিবিড় লজ্জা। বুকে জড়তা। মনের মধ্যে প্রশ্ন, আয়ান কি ভাবছে লুকিয়ে লুকিয়ে পুণ্য করছে সে? তাই যদি হয়, তবে এ পুণ্যফলের দাবিদার হবে না কেন সে? ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকে করুণ চোখে চেয়ে থাকতে দেখে আয়ান মধুর গলায় বলল: যুগটা সমান অধিকারের। বেদের যুগে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার ছিল। সেই যুগে নারীর মর্যাদা ছিল। গোকুলের কিশোর কৃষ্ণ আজ তার আওয়াজ তুলেছে ঘরে ঘরে। আমি তার দাবিকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। সুতরাং বুঝতে পারছ প্রেমের সম্বন্ধেও নারী পুরুষ সমান সেখানে প্রণাম করে তুমি তার গৌরব নষ্ট করে দিচ্ছ। বিশ্বাসের ধার ক্ষয়ে যাচ্ছে তাতে।

রাধার বুকের ভেতরটা চমকে ওঠল আয়ানের অদ্ভুত

আশ্চর্য যুক্তিতে। চোখের চাহনিতে একটা নিবিড় ব্যথার ছায়া পড়ল তার। সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গিয়ে বলল: আমার নারী হৃদয় ভালবাসার পূজা করতে চায়। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মত। পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের ওপরই তার স্নিগ্ধ আলো সমান হয়ে পড়ে। কেউ ছোট হয় না। সমান হয়ে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়।

রাধা! চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল আয়ান। একটা অদ্ভুত আশ্চর্য ভাললাগার আবেগে, আনন্দে, গৌরবে তার দু'চোখ চকচক করছিল। থমথমে গলায় বলল: রাণী আমার, সখী আমার—একি অদ্ভুত কথা শোনালে তুমি। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণও বোধ হয় এমন হৃদয় নিঙরানো ভালবাসার কথা বলতে পারত না। কিন্তু প্রিয়তম আমার স্বপ্নের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে নিজেকে তো আমি দান করতে পারছি না। স্বপ্ন বৃত্তান্তটা ভুলতে পারছি কৈ? স্বপ্নটা আমাদের সম্পর্কের মধ্যবর্তী হয়ে তোমার আমার ব্যবধানকে শুধু বড় করছে। কতদিন বিয়ে হল, তবু আমরা কেউ কাউকে ছুঁতে পারিনি। নক্ষত্রের মত পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আছি। দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন বিরাট ব্যবধান; একে অন্যকে ছুঁতে পারে না; কাছে আসতে পারে না তেমনি একটা ফাঁক ও দূরত্ব আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আছে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে হাঁটলেও একে অন্যকে বোধ হয় আর ছুঁতে পারব না।

প্রিয়তম তুমি আমার পূজো চাও না, সে তোমারই যোগ্য। কিন্তু একটা কাঁচের ঘরে তুমি বাস করছ। আমার ভক্তি দিয়ে তোমার ঐ অহংকার ভাসিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছি। রূপের দেমাক দেখাতে গিয়ে উমা শিবের তেজ সহ্য করতে পারেনি। তাই অনেককাল শিবের জন্যে তাকে তপস্যা করতে হয়েছে। যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি আছে। একদিন আমি তোমার

সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছিলাম, আমার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে।

আয়ান তর্ক না করে হাসল রাধার কথায়। বোধ হয় তার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু আয়ানের অজানা ছিল না। তাই রাধার দুঃখটাই সে শুধু দেখতে পেত, দোষ দেখতে পেত না। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলত সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালবাসা হবে সার্থক। এখনও পর্যন্ত তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।



দূরে ছায়াঘন স্নিগ্ধ তমালকুঞ্জ। ঐখানেই বাঁশি বাজে মোহন সুরে। কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে যেন ডাকছিল। বাঁশির সুর বলছিল গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এস। এস হাওয়ায় ভেসে। বুকের ভেতরটা তার যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠল। সারা শরীর গরম হয়ে গেল। শৌচাগারে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বারান্দায়

দাঁড়াল। ফুরফুরে শীতল হাওয়ায় দেহ স্নিগ্ধ হল। কিন্তু বুকের ভেতরটা বাঁশির সুরে মোচড় দিয়ে ওঠল। খুব মিষ্টি বাঁশি। কৃষ্ণের মুখটা মনে পড়ছিল। কিন্তু সেই মুখ কৃষ্ণের দিকে তাকে টানতে লাগল। হৃদয়টা কৃষ্ণময় হয়ে গেল। মনটা অনেক আগেই কৃষ্ণের কাছে চলে গেল। কিন্তু দেহটাই পড়ে রইল। দেহের যন্ত্রণায় তার মন টাটাতে লাগল। মনকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। অনুভূতি, উপলব্ধি দিয়ে তার সবটা পরিমাপও করা যায় না। সে শূন্য নিরাকার। মন যাওয়ার মূল্য কি? ইন্দ্রিয় সর্বস্ব স্থূল দেহই সব। দেহটাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ভাষা দিয়ে ভাব দিয়ে হৃদয়ের অভ্যন্তরের অভিব্যক্তিকে বোঝান যায়। ইন্দ্রিয় সর্বস্ব স্থূল দেহটাই যদি পড়ে রইল তাহলে তার সান্নিধ্য, সঙ্গ পাবে কেমন করে? কেমন করে তার সঙ্গে কথা বলবে? সে বা কার উপর অভিমান করবে? ঝগড়া করবে?

সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে রাধার চল্লিশ বছরের এই জীবন-সংসার, সমাজের পাহাড় ডিঙিয়ে দেবতার মত স্বামী, ভারতীয় নারীর সুনাম ছেড়ে অভিসারিকার মত বেরিয়ে পড়তে চাইল। মনকে বলল- চলো, চলো কৃষ্ণ একবার তোমাকে দেখতে চাই। বিশ বছর দেখি না তোমায়। তোমার ফাল্গুনের মত যৌবনকে কল্পনা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না। আমার দু' চোখে লেগে আছে তোমার মুকুলিত যৌবনের তারুণ্যে ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী! আমার স্বপ্ন ভঙ্গ না করে কৃষ্ণ তোমায় একবার দেখতে চাই।



রাধার বয়স বাইশ আর কৃষ্ণের পনেরো। বয়সের পক্ষে কৃষ্ণ একটু বেশী রকমের পূর্ণ বয়স্ক। তার বুদ্ধি, সাহস, শক্তি, কৌশল, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে ঐ বয়সেই জনপ্রিয় করেছিল। তার প্রতি মথুরাবাসীর কি দুরন্ত আস্থা আর প্রত্যয়! কৃষ্ণকে নিয়ে কত অদ্ভুত অলৌকিক গল্প প্রতিদিন তৈরি হয়। এসব গল্প করতে এবং বলতে প্রত্যেকের ভেতর কি প্রচন্ড উল্লাস! ভয়ংকর একটা ইচ্ছার জোর যেন ঐসব গল্পে পেত তারা। কার্যত কৃষ্ণকে নিয়ে একটা প্রবল আবেগ সমগ্র মথুরার উপর ভেঙে পড়ল হঠাৎ। সমস্ত মানুষ কৃষ্ণকে পেয়ে সহস্র যৌবনশিখায় জ্বলে উঠল যেন! তাদের শিরায় উপশিরায় আত্মসমর্পণের আবেগ। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের সঙ্গে মথুরাবাসীর সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ভালবাসা, বিশ্বাস আনন্দ

যেন অনির্বচনীয় হয়ে মিশল। কংসের ভয়ংকর অত্যাচারে যে জীবন তছ্‌নচ্‌ হয়ে গিয়েছিল, যার থিত ভিত গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, হাসি আনন্দ নিভে গিয়েছিল, মনোবল, সাহস শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল, কৃষ্ণের বাঁশী যেন পুনরায় ফিরিয়ে দিল তাদের। মরা নদীতে যেন বান এল।

প্রতিদিন আপনার ক্ষুদ্র গৃহকোণে যে ছিল বন্দী, কৃষ্ণ তাকে হঠাৎ বাঁশীর সুরে অজানার দিকে ডাক দিল। সে কিছুই ভাববার সময় পেল না। সে চলল কৃষ্ণেব বাঁশীর ডাকে সামনের অন্ধকারে। অন্ধকারে ভয়ে থমকে দাঁড়ায়নি, কিংবা ভয় পেয়ে সরেও যায়নি। উৎসাহের দীপ্তি, আনন্দের আবেগে তার ভিতর বাইরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। বাঁশীর মোহন সুরের এমনি আকর্ষণ যে অন্ধকারকে অন্ধকার মনে হল না। তার জন্য দীপ জ্বেলে নেওয়ার তব সইল না। কৃষ্ণের বাঁশী সমস্ত মথুরাবাসীর মন প্রাণ এমনি করে ডাকছিল যে সাতপুরুষেব ভিটে মাটির মায়া-বন্ধনও শিথিল হল। পড়ে রইল তার ঘর-দোর, ক্ষেত-খামার। চোখ বুজে এল গোকুল থেকে বৃন্দাবনে। এক অন্তহীন আবেগে সে গোটা দেশের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোথায় চলেছে জানে না তার ঠিকানা। কোথায় পৌঁছবে সে কথাও তাদের মনে উদয় হল না। গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবনের মানুষ যেন অন্ধকার রাত্রিব অভিসারিকা। অন্ধকারের ভেতর তারা কিছুই দেখছে না। লক্ষ্য তাদের চোখে ঝাপ্সা। পথটাই শুধু সত্য। কৃষ্ণেব বাঁশির সুরে তারা উন্মাদ। কেবল আবেগ আর চলাই হল তাদের মন্ত্র। চরৈবেতি

চরৈবেতি।

সেই সময় বৃন্দাবনের চিত্র ও চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তাকে ঠিকমত গুছিয়ে ভাববার মত অবস্থা কোথায় রাধার? কৃষ্ণ তখন বৃন্দাবনময়। মুক্তির হাওয়া লেগেছে মানুষের

অভিসারিকার মত প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে মর্তভূমির দিকে ধাবিত হয়ে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে যুগান্তরের ঘুম থেকে হঠাৎ জাগিয়ে দিল। বহুকালের জমা করা ছাই ভস্মের স্তূপ যেন কথা কয়ে ওঠল। কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিও তেমনি মথুরাবাসীকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিল। ঘুম ভাঙতে মুরলীধ্বনি সমস্ত শিরা-উপশিরার মধ্যে বেজে গেল। সমস্ত মনটা এমন করে বাঁশির দিকে ছুটে গেল যে দ্বিধা করার তর সইল না। মনে হল, যেন ...কের মধ্যে কোন অজানাকে, অপূর্বকে, কোন সৃষ্টিছাড়াকে তারা পেয়েছে। ঘরের মোহ কেটে মনটা অভিসারিকা হয়ে ওঠেছে।

রাধা জানে কৃষ্ণের বাঁশির ডাকের মোহিনীশক্তি কত? ঐ বাঁশি যখন বেজে ওঠে তখন বুক কেমন করে উঠে? সমস্ত প্রাণ মনকে এমন করে টানে যে ঘর, সংসার, স্বামী, সমাজ মনে হয় স্থূল। বাঁশিটাই সত্য।

প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক না উড়ে পুড়ে।
ওগো যায় যদি তো যাক না চুকে,
সব হারার হাসি মুখে,
আমি, এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরাণ পুরে। (রবীন্দ্রনাথ)

তার বুকের ছন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চন্দ্রাবলী বলত :

ওগো আপন যারা কাছে টানে।
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে চুরে। (রবীন্দ্রনাথ)

পনেরো বছর আগে কৃষ্ণ সম্পর্কে এরকম কোন আবেগ রাধার হৃদয়ছন্দে বেজে ওঠেনি। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণের

পর থেকেই রাধার মনে জাগত তার ভাগ্যদেবতার রথ এসেছে। কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দ দিন-রাত্রি তার বুকের ভেতর শুনতে পাচ্ছে মৃদঙ্গের মতন। প্রতিমুহূর্ত মনে হত একটা পরমক্ষণ বুঝি এল তার জীবনে। এলও অপ্রত্যাশিতভাবে। কিন্তু তার জন্য কোন কামনা ছিল না। কিংবা কোন প্রত্যাশা নিয়ে সে বসেও থাকেনি।

পনেরো বছর বয়সে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এলে, রাধা টের পেল পঞ্চমবর্ষীয় কৃষ্ণের দুষ্টুমী আর ছেলেমানুষী মর্মের কত গভীরে দাগ কেটেছিল। অন্তরের মধ্যে শিশু কৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজানোর সুর বাজছিল। সেই অনুভূতিকে তীব্র করে তুলল, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবতী। হৃদয়ে তার প্রথম স্পর্শ বয়ে আনল বিশাখা। কৃষ্ণের মত ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে বাঁশী ধরার ভঙ্গী করে দু'চোখে বিদ্যুৎ হেনে, কখনও চোখ বুজে তন্ময় হওয়ার ভান করত। আর বলত :

যখন দেখা দাওনি রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশী।
এখন চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে সুর যে আমার
গেল ভাসি।

এখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে, (রবীন্দ্রনাথ)
এখন আমাব সকল ভালবাসা রাধারূপে উঠল ফুটি।



রাত যত গভীর হতে লাগল অন্ধকার তত ঘন আর নিবিড় হয়ে ওঠল। ঘর অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার। আকাশ অন্ধকার। সব অন্ধকার। মানুষের যা কিছু সুন্দর অনুভূতি তা এই অন্ধকারেই পাওয়া। কিছু আশ্লেষে চাওয়া তাও তো এই অন্ধকারেই। তাই অন্ধকারের ভিতরে রাধা একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। পনেরো বছর আগের কথা। তবু ঘটনাগুলো জীবন্ত। তাই এই অন্ধকারের ভেতর চেয়ে আছে। গাছের পাহাড়েরা যেমন চেয়ে থাকে তেমনি আছে। রাধা ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবেও! যৌবনে কৃষ্ণের সঙ্গে মেলামেশার মধুর দিনগুলোর স্মৃতি অন্ধকারের ভেতর তাকে টানতে লাগল। বিয়োগান্ত কাব্যের

মত যা বাধার জীবনের মধ্যেই অদৃশ্য কালিতে অব্যক্ত ভাষায় লিখেছিল ভাগ্যদেবতা।

বৃন্দাবনের পথে বেনু বাজাতে বাজাতে চলেছে কৃষ্ণ। তার বাঁশীর সুরে রাধার বুক উথাল পাথাল করল। তীব্র আনন্দের উল্লাস সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীরটা যেন হিমবাহের মত গলে গলে নিঃশব্দে ঐ বাঁশীর সুরের সঙ্গে মিশল। হাতের কাজ ফেলে রাধা জানলার পাশে দাঁড়াল। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোকুলের সেই ছোট্ট কৃষ্ণ এখন একজন পরিপূর্ণ যুবক। সে এখন রীতিমত পুরুষ মানুষ। তার সামনে বেবোতেই লজ্জা করে। চোখের দিকে ভাল করে তাকানো যায় না। অজানিত লজ্জার আতঙ্কে দেহ শির শির করে ওঠে। বাধার মনে হল লজ্জা নয়, সে ছিল তার পুলক। ভেতরটা অস্থিরতায় ফেটে পড়ছিল। আর, প্রবল উত্তেজনায় হাত দুটি নিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে সমানে কচলাচ্ছিল।

বিশাখা চুপি চুপি তার পিছনে যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, রাধা জানত না। লুকিয়ে লুকিয়ে তার কৃষ্ণ দেখার দৃশ্যটাকে ভীষণ উপভোগ করতে লাগল। যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখা গেল এবং তার বাঁশীর সুর শোনা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত রাধা জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পুলকিত শিহরণে তার দু হাঁটু থরথর করে কাঁপছিল। আব নিজের মনে ভাবছিল, কৃষ্ণ কেন আকুল করে তাকে? বুকের ভেতব কৃষ্ণ সম্পর্কে এ মুগ্ধতা কার সৃষ্টি? কৃষ্ণের প্রতি তার অনুভূতি এমন তীব্র হয়ে ওঠল কিসের আকর্ষণে? দশ বছব পব কৃষ্ণকে দেখল। এখন সে গোকুলের গোপাল কিংবা কানু নয় আর। বৃন্দাবনের মুরলীধর কৃষ্ণ। তার নাম শুনলেই বৃন্দাবনের নরনাবী নির্বিশেষে প্রেমে আকুল হয়। অনুবাগে উতলা হয়। কৃষ্ণ নাকি বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে। বৃন্দাবনের প্রতিটি মানুষ নাকি আজ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কোন নাম নয়। কৃষ্ণ একটা শক্তি। কৃষ্ণ মানেই

বৃন্দাবন। কৃষ্ণ মানুষের প্রেম, ভক্তি, সাহস, বিশ্বাস, উদ্যম, আনন্দ। হৃদয়ের মধ্যে এই সুন্দর অনুভূতির যাতনা এবং উল্লাস তাকে স্থির থাকতে দিল না। তাই একটা আবেগ, সুন্দর একটা অনুভূতির শিহরণ আকাশজোড়া বিদ্যুতের মত তার ভিতর চমকিত হতে লাগল। সমস্ত সত্তা যেন একাগ্র হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল। মুগ্ধ রাধা তন্ময়তার গভীরে হারিয়ে গিয়ে বিড় বিড় করে স্বগতোক্তি করে বলল: কৃষ্ণ তুমি কে জানি না, কিন্তু তোমাকে দেখা থেকে আমার হৃদয় মানছে না। মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। থেকে থেকে মনে হয় তুমি আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। এই একঘেয়ে বধূ জীবনের ক্লান্তির বিষণ্নতায় দমবন্ধ ঘরের লাগোয়া একফালি আলো-হাওয়ার বারান্দা তুমি।

ঘাড় ঘোরাতেই বিশাখার সঙ্গে চোখাচোখি হল রাধার। বিশাখা ফিক্ করে হাসল। রাধা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়মিশ্রিত উত্তেজনাজনিত লজ্জায় সহসা যেন দপ্ করে নিভে গেল। নিমেষে মুখখানা আঁধারে মলিন হল। বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে গলার স্বর লজ্জায় জড়িয়ে গেল। বলল: বি-শাখা-আ! তুই-ই।

বিশাখা তার ভীরু বুকের অভ্যন্তরটা যেন দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলল: বিস্ময়ে যার এত প্রেম জাগে, সে সখী কেমন বল? কার অনুরাগে বিরহী রাই হয়ে উঠে চঞ্চল? কার নাম শুনে তার চোখে আসে এত জল? সখী সে কে হয় তোর বল?

বিশাখার প্রশ্ন শুনে কি যেন হয়ে গেল রাধার? একটু থমকে গিয়ে বলল: আমার সুন্দর ভাল লাগার অনুভূতির মধ্যে আর কোন ভাবনা টেনে এনে এই স্বপ্ন নষ্ট করে দিও না। তুমি যা ভাবছ, তার কিছু নেই আমার মনের মধ্যে। সত্যি কিছু নেই।

কথাগুলো বিশাখার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাথা গোঁজ করে

দাড়িয়ে রইল। ইচ্ছে হল বিশাখাকে শুনিয়ে বলে —তুমি কি বুঝবে? আমার ভালবাসা কি এতই তুচ্ছ যে, যাকে তাকে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাব? আমি তো ভারতীয় নারী। হিন্দু নারীর সংস্কার, বিশ্বাস, পরলোকের ভয়, স্বামী-সংসার-সব কিছুর ভিতর আমার সত্তা টুকরো টুকরো হয়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই তো একই সঙ্গে একাধিক মানুষকে ভালবাসি। এ ভালবাসার ক্ষমতা সব মেয়ে-পুরুষের আছে। তবে, সেটা কখনও কখনও বিশেষ হয়ে ওঠে। যদি তার এক টুকরো ভালবাসা কৃষ্ণ পেয়ে থাকে — তাতে কি আমি রিক্ত হয়ে যাব? তা কি সত্যিই আমার দেবার ক্ষমতার বাইরে? মেয়েমানুষের স্বভাবই হল অনাবিলভাবে সুস্থতার সঙ্গে কোন সুন্দর কিছুই নিতে শেখেনি সে জীবনে।

এসব কথা কিন্তু তার মুখ ফুটে বেরোল না। শরীর মন আন্দোলিত হল তার। মুখে উদ্‌ভ্রান্তির ছাপ। চোখে একটু বিব্রতভাবও খেলে গেল।

বিশাখা চুপ করে ছিল। কিন্তু সখীর কথাগুলো সে বিশ্বাস করেনি। মুখ টিপে হাসল। মেয়েমানুষই মেয়ে-মানুষের ছলনা, প্রতারণা ঠিক ধরতে পারে। রাধার কথায় বিশাখা কেমন থম হয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ বেজার করে প্রস্থান করল। কিন্তু তার ঐ নীরব ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্থানের ভিতর একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা ছিল, আর ছিল দুরন্ত, অবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন সংকেত।

বিশাখা চলে গেলে নির্জন ঘরে রাধা নিজের মুখোমুখি বসল। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন নিজেকে তন্ন তন্ন করে দেখে, রাধাও তেমনি নিজেকে প্রশ্ন করছিল আর নিজেই তার উত্তর দিচ্ছিল। এই অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল সত্যিই কি তার কৃষ্ণপ্রেম? বিশাখাকে দেখে অমন লজ্জা পাওয়াতে সব ব্যাপারটা গন্ডগোল হয়ে গেল। রাধা নিজেও ভেবে পেল না, বিশাখার ওপর অকারণে রুষ্ট আর অসহিষ্ণু হল কেন? পরপুরুষের চিন্তায় উষ্ণতাতে তার মনটা যে একটুক্ষণ ভরে

দিয়েছিল একথা কেমন করে অস্বীকার করবে? পরপুরুষকে ভালবাসাটা বিকেলের রোদের মত। কিছুক্ষণের জন্য বিকেলের রোদ চারদিক ঝলমল করে দিয়েই মরে যায়। কিন্তু এ যুক্তি এখানে অচল। আয়ান তার জীবনে আসার অনেক আগে কৃষ্ণের সঙ্গে তার একটা মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। সেই সম্পর্কের' সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবনের সম্পর্ক যোগ হয়েছিল। একসঙ্গে দুটো পুরুষকে ভালবাসার কথা সে কখনও ভাবে না। মনেও ঠাই দেয় না। সে তেমন মেয়েই নয়।

কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা সন্দেহ তীব্র হল। নিজেকে শাসিয়ে শুনিয়ে বলল: না, না। আমি তেমন মেয়ে নই। একই সঙ্গে অনেকে হয়তো দুটি পুরুষ মানুষকে ভালবাসে, প্রেমও করে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীব ভালবাসার মধ্যে স্বামীর মালিকানা আছে। কোন পুরুষই ভালবাসার ভাগাভাগি বিশ্বাস করে না। কোন নারীও চায় না তার শরীরকে পণ্য করতে। শরীরকে না এনেও সুন্দর প্রেমের মধ্যে ডুবে যাওয়া যায়। একজন মানুষ সারা জীবন পথ চলে কোন কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই। কিন্তু আয়ান স্বামী হয়ে তার দেহ মনের কোন্ প্রত্যাশা পূরণ করেছে? প্রাপ্তির ঘরেও তার অশেষ শূন্যময়তা। এই শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা থেকেই প্রত্যাশার কথা মনে আসছে। সব মানুষই তাই চায়। পাহাড়ে যখন ওঠে, তখন তার চোখ থাকে চূড়োর দিকে; সমুদ্রে ভাসে অন্য তীরের প্রত্যাশায়। তবে কি সে মনে মনে অনুরূপ কোন প্রত্যাশা নিয়ে কৃষ্ণকে দেখেছে? হয়ত তাই-ই। মনের ভেতর তার ভালবাসা পাওয়ার জন্য একরকম কাঙালপনা আছে। তাই বোধ হয় প্রেমহীন জীবনে দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি তার ও আয়ানের সব নিজস্বতা ও আনন্দকে যেন ক্লান্ত আর অবসন্ন করে তুলেছে। বিয়ে হলেই কি স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ের সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে? প্রতিদিনের নিয়মমাফিক সম্পর্ক আর অভ্যাসের মধ্যে অধিকাংশ বিবাহিত ভালবাসা হারিয়ে যায়। যেমন হয়েছে আয়ানের সঙ্গে। ইদানীং

তাকে তার মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পায় না। তার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় মরে যাওয়ার মতই হয়েছে। একরকম নেই-ই বলা যায়। বিশাখাও জানে সেকথা। আয়ান, হারিয়ে যাওয়া গ্রীষ্মের শিমূল তুলার মত একা। চলেও যাবে একা একাই। আয়ানের প্রাণহীন সম্পর্কটাকে মেনে নেয়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

কিন্তু পনেরো বছর আগে কৃষ্ণকে সামাজিক বিধি-বিধানের বাইরে দেখতে গিয়ে প্রাণের ভিতর কত বিস্ময়, ভয়, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ জেগেছিল। অজানা ভবিষ্যৎ ও পরিকল্পনা নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা বিস্ময় টের পেল। বুকের ভেতর সদ্য আকাংখার এক সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল তার। বাঁধ দিয়ে তার স্রোতকে ঠেকানোর চেষ্টা কবলে নিজেকেই ছোট লাগবে, ভীষণ বঞ্চিত লাগবে, নিজের সম্মান ও গৌরববোধে ঘা লাগবে। কিন্তু এসব কথা তো অন্যকে বোঝানো যায় না ঠিকভাবে। তাই বিশাখাকে মনের অভ্যন্তরে টৈটুম্বুর সুখের কোন কথাই জানতে না বুঝতে দেয়নি। এ কিন্তু রাধার চল্লিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা। কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেল তখনই হৃদয়ের গভীরে টেল পেল তাকে। বৃক্ষের শিকড় ছাড়ার কাজটা একেবারে নিঃশব্দে ঘটে। শিকড়মাত্র নিঃশব্দ সঞ্চারী। যখন প্রোথিত হয় তার মূল, তখন বৃক্ষ ও মাটি টের পায় না মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কি ঘটছে। কিন্তু যখন উৎপাটিত হয় তখনই অনুভব করে কতদূর পর্যন্ত সে মূল প্রসারিত ছিল, আর কিভাবে মৃত্তিকাকে তার একমাত্র অবলম্বন ভেবে আঁকড়ে ধরেছিল। কেন যে এমন বিপজ্জনকভাবে ভাল লেগে যায় এক একজন পুরুষকে এ জীবনে, রাধা তার চল্লিশ বছর বয়সেও ভেবে পায় না।

কৃষ্ণ তার চেয়ে বয়সে ছোট, তবু ভাল লেগে গেল তাকে। ভাললাগার আর ভালবাসার কোন নিয়ম বাঁধন, শাসন নেই। মনও মানতে চায় না নিষেধ। কৃষ্ণের কথা আর তার বাঁশীর

শব্দ কানে এলেই যেন খুশিতে ভরে যায় মন। কে জানে? কি থাকে, কি আছে তার নামেতে?



কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসার পরে একটা অদ্ভুত কান্ড করেছিল। তবে, কত পরে ঠিক মনে নেই সেদিনটা কিন্তু মনে গেঁথে আছে রাধার। পনেরো বছর আগের ঘটনা হলেও চল্লিশ বছর বয়সেও রাধা ভুলেনি তাকে। নক্ষত্রভরা নীল আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাধা দেখল নবীন নীরোদ নীল নীরজমনি কৃষ্ণকে। নীলকান্তমনির মত তার রূপ রাতের আঁধারকে ছাপিয়ে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। কাঁধের কাছে ঢাল হয়ে আছে একরাশ কোঁকড়া কালো চুল। সমুদ্রের ঢেউ এসে লেগেছে যেন তার গায়। ভ্রমর কালো চোখের উপর কালো পল্লব। আর ময়ূরের মত নীল গ্রীবা। এই কৃষ্ণকেই

জানলা দিয়ে চুরি করে দেখেছিল রাধা। দূরে থেকেই তার দৃষ্টিতে ঝড়ে পড়েছিল মুগ্ধতার আলো। শুধু দূর থেকে ঐ দেখাতেই তার হৃদয় মন জুড়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে! অতখানি সুধা যে মানুষের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠে থাকে এই বিস্ময় এখনও লেগে আছে রাধার মনে।

বেশ কদিন পর মেঘ ছেড়েছে, বৃষ্টি ধরেছে, আবার রোদ ওঠেছে। বৃন্দাবনের বাসিন্দাদের মনে কদিন ধরে গুমোট একটা অশান্তিতে ছেয়ে ছিল। সারা দিন ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকায় ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারেনি। সওদা করতেও যাওয়া হয়নি! বৃষ্টি ধরলে পাড়ার মেয়ে বৌ মিলে কালিন্দী পেরিয়ে মথুরার উপকণ্ঠে বাজারে গেল ঘি, মাখন, ননী বিক্রী করে অন্য পণ্য কিনে আনতে।

বৃন্দাবনের আভীর পল্লীর পুরুষেরা গো-পালন, চাষ-আবাদ এবং ঘি, মাখন প্রস্তুত করে ঘরে বসে। আর বাড়ির মেয়ে-বৌরা মাথায় পসরা নিয়ে গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে সেই সব দ্রব্যসামগ্রী বেচে। এটাই হল আভীর পল্লীর জীবন ও জীবিকার নিয়ম। কিন্তু রাধা এসব কাজে অভ্যস্ত নয়। স্বামী আয়ান সংসার ছাড়া এক নিরীহ মানুষ। দায়িত্বজ্ঞানহীন এই মানুষটার সংসার বিতৃষ্ণার জন্যে গোটা সংসারের ধকলটা রাধাকে একা সামলাতে হয়। সংসারের ভারে সে ন্যুব্জ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে স্বামীর ওপর দারুণ দুঃখ অভিমান হয়। আজ নিজের মনেই ভাবে এসব মানুষের বিয়ে করতে নেই। কেন যে এরা বিয়ে করে? নিজেরাও কষ্ট পায় পরের ঘরের নিরীহ, নির্দোষ একটা মেয়েকেও যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তারও যে একটা মন বলে পদার্থ আছে, সে কথাটা আয়ান ভাবে না বলেই দুঃখের সমুদ্র উথলে ওঠে বুকে। নীরব কান্নায় চোখ ঝাপ্সা হয়ে যায়। বৃন্দাবনের বৃষভানু নন্দিনী এখন রাজার ঝিয়ারি নয় আর। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বৌ। সংসারের কঠিন মাটিতে প্রতিদিন ঘা খেয়ে খেয়ে সে নীরব আর নির্জীব হয়ে গেছে। চঞ্চলা

মুখরা ঝর্ণার মত প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে আর সে ছুটে চলে না।

বর্ষার জলে তাব শূন্য বুক হঠাৎ ভরে উঠল, ধীর স্থির মন্থর গতিতে সে একা একা চলেছিল সকল মেয়ে সঙ্গী-সাথীর পিছন পিছন। দুপাশের গাছের ডালপালায় নুয়ে পড়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাব ছোঁয়া লেগে ডালপালাগুলো যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেছিল। রাধা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পরিচিত বন পথের দিকে চেয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল এ যেন অন্য কোন মায়াময় রূপ। পাখী ডাকে। বিচিত্র বর্ণের একটা কাঠঠোকরা পাখি ভিজে ডাল ঠোকরাচ্ছিল। তার শক্ত চঞ্চু দিয়ে ক্রমাগত বৃক্ষের কঠিন ত্বককে আঘাত করে চলেছে। নিদারুণ ব্যথায় পাতাগুলো তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। পত্রান্তরাল থেমে নাম না জানা একটা পাখীর কর্কশ চিৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে গেল কোন সুদূরে। রাধার বুকের ভেতর ভীষণভাবে চমকে ওঠল। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে কোন পাখি দেখতে পেল না আকাশে। গোটা নীল আকাশখানা মিষ্টি নরম রোদে ঝলমল করছে। রাধার মনে হল এ হয়তো তারই গভীর অভ্যন্তরে শূন্যতা মথিত জীবনের অসহায় আর্তনাদ! বাতাসে তার করুণ দীর্ঘশ্বাসই হাহাকারেব মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিছুটা এগোতে পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকাল রাধা। কৃষ্ণকে দেখে রাধার অবচেতন মনে কেমন একটা শিরহণ খেলে গেল। চোখের তারা নীরব লজ্জায় নত হল। তবু ভীরু চাহনি মেলে সে কৃষ্ণকে দেখল। মেঘে ঢাকা আকাশের মত থমথমে তার মুখ চোখ। মুখে প্রতিপদের চাঁদের মত একফালি হাসি। তার নীরব প্রীতির স্পর্শটুকু রাধার মন ছুঁয়ে গেল। ইচ্ছে হল তার নীবব অর্থপূর্ণ হাসির উত্তরে, হাসি দিয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু কোথায় যেন তার বাধা। পনেরো বছর আগের স্মৃতিকে চেতনার রঙে রঞ্জিত করে তুলেছিল রাধা। কিন্তু তা হল না। নিজের মনেই তার একটা নিয়েধের বাধা প্রাচীর হয়ে উঠেছিল। সেটাকে অতিক্রম কবতে পারল না।

তেমনটি রয়ে গেলে। কোন এক নীরব অধরা সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যের প্রতিমা তুমি। তোমাকে দেখলে মন ভরে উঠে। কোন দুঃখ থাকে না। প্রাণ খুলে মিশতে ইচ্ছে করে।

তবুও রাধা দাঁড়াল না। মুখ টিপে ঠমকে ঠমকে সে হাঁটছিল। মনের মধ্যে তার বৈশাখী ঝড় তখন। কৃষ্ণ তার পাশাপাশি হাঁটছিল। রাধাব বুকের ভেতর খুশির সুর জাগল। চলতে চলতে কতকগুলো বুনো ঝুমকো লতার ফুল ছিঁড়ে বিনুনীতে গুঁজল। নিজের খুশিতে বিভোর হয়ে বলল: বাঃ! এ দিকটা তো বেশ চমৎকার! ভীষণ সুন্দর!

হঠাৎ উত্তপ্ত একটা স্পর্শ পেয়ে বাধা চমকে কৃষ্ণের দিকে চাইল। সকালের সূর্যেব সোনা রং-এর প্রতিবিম্ব পড়েছিল কৃষ্ণের মুখে। প্রভাতী আভায় শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের মুখশ্রী নীল আকাশের মাধুরিমায় ভরে উঠল। পথের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাধা। অপলক চোখে চেয়ে রইল কৃষ্ণেব দিকে। হাতখানা তখনও কৃষ্ণের হাতে ধরা।

সখীদের ডাক শোনা যাচ্ছিল অনেক দূর থেকে। কিন্তু সে ডাক বাধাব কানে গেল না। রূপময়ী কোন অসীম বিশ্বেব সৌন্দর্যের আকাশে তার মন প্রজাপতিব মতন বিচিত্র বর্ণের ডানা মেলে দিয়ে যেন কোন অসীমে মন উধাও হয়ে গেল। রাধার অপলক দুই আঁখি স্বপ্নাতুব হল।

এমন একটা পরিবেশে তাবা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ভাল লাগছিল এই ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার বাজ্য। কৃষ্ণেব চাহনিও কেমন যেন হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর তার কেঁপে গেল। স্নিগ্ধ গলায় বলল: তুমি যাবে না? সঙ্গীবা তোমাকে ডাকছে। অনেক দূব থেকে তাদের ডাক ভেসে আসছে।

রাধা লজ্জায় চমকে ওঠেছিল। মুখে সলজ্জ হাসির আভা ফুটল। কৃষ্ণের হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

কৃষ্ণ মরিয়া হয়ে বলেছিল: আর একটু দাঁড়াবে না? বড় ভাল লাগছিল তোমাকে। এখন এমন করে ছেড়ে দিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মায়া হচ্ছে। স্মরণ করে না দিলেই ভাল হত।

কৃষ্ণের বচনে রাধাব বুকের ভেতর তরঙ্গ খেলে গেল। তথাপি কৃষ্ণকে মেনে নিতে সংস্কারে বাধল। বলল: আমার বিস্ময় ছিলে তুমি। তোমাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার চরিতার্থ হল। কিন্তু আর নয়। আমি পরস্ত্রী। তোমার কাছ থেকে একটু তফাতে, একটু দূরে থাকাই আমার ভাল। আর আমাদের দেখাশোনা না হওয়াই উচিত। আমাকে এমন করে লুকিয়ে দেখার আর চেষ্টা কর না। আমাকে মনে মনে ঘেন্না কর।

কৃষ্ণ কিন্তু সঙ্গ ছাড়ল না। রাধার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। স্বপ্নাতুর চোখে রাধার দিকে চেয়ে বলল: আমাকে তোমাব খুব খারাপ লাগল; তাই না? আমাকে সন্দেহ করে তো এসব কথা বললে?

রাধা অপ্রস্তুতভাবে হাসল। বলল: জানি না যাও। তুমি একটা ইয়ে—তারপর কৃষ্ণের খুব কাছ ঘেঁষে গায়ে গা লাগিয়েই হাঁটছিল। যেতে যেতে বলল: আজই শেষ। আর আমাকে কোন দিন দেখতে পাবে না। লোকে যে যা বলুক, আমি জানি, তুমি জাদু জান। গাঁশুদ্ধ লোককে তুমি বশ করেছ। তুমি তাদেব ধ্যান জ্ঞান। তোমাকে তারা বিশ্বাস করে। আমার স্বামীও তোমার ভক্ত।

কৃষ্ণেব দুচোখে খুশি খুশি ভাব উথলে ওঠল। মজা করার জন্যে বলল: আয়ান তোমায় খুব ভালবাসে, না?

বাধার দুচোখ সহসা জল টলটল করে ওঠল। ধরা গলায় বলল· তা বোধহয় বাসে।

কেন, তুমি জান না?

উত্তবটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে রাধা বলল· একটু সরে হাঁট। লোকে দেখলে কি ভাববে বলত?

ভাববে, প্রেমে পড়েছে।

ছিঃ! অমন কথা মুখে বলাও পাপ।

সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়।

গোঁফের রেখা ওঠেনি ভাল করে। এর মধ্যে এত ভালবাসা পেলে কোথায়? লোককে মুগ্ধ করার বিদ্যেটা শিখলে কি করে? আজ পর্যন্ত তোমার মত এত দুঃসাহস কেউ দেখায়নি।

ভালবাসি বলেই ঠেকাতে পারে না আমাকে।

সত্যি বলছ?

সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলব কেন? সকলকে আমি ভালবাসি। প্রত্যেকের ভাল চাই। মানুষের জন্য, পৃথিবীর জন্য, আমার শুধু শুভ কামনা আছে। মানুষ মানুষ হোক। সুখী হোক, সৎ, আদর্শবান, বীর হোক এই চিন্তাই করি সারাদিন। প্রেমকে, ভালবাসাকে আমি তার উপকরণ করেছি। এই উপকরণ ভাঙিয়ে মানুষের জীবন ধারণের সমস্যা সব মিটে যাক। সকলে সুখ আর মঙ্গলের ভেতর দিয়ে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে নিক। নিজেকে নিজের কাছে বিলীন করে দিতে পারাতেই সুখ এবং মুক্তি। রাধা তুমি আমি কেউ একা কিংবা বিচ্ছিন্ন নই। আমরা প্রত্যেকেই বিরাট মহান পুরুষের কর্মযজ্ঞের জন্য নিবেদিত। কিন্তু এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসী-প্রাণ মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা, সত্যবাদিতা বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে এবং বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। আমি সেই ঈশ্বরকে খুঁজেছি মানুষের প্রেমের মধ্যে। তোমার মধ্যে আমি তাকে দর্শন করেছি রাধা। তুমি আমার শক্তি সাহস, প্রেরণা। তোমাকে না পেলে আমার প্রেম হবে অপূর্ণ। আমার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। সাধনা বিফল হবে, প্রেম-বিশ্বাস মিথ্যে হয়ে যাবে। বল রাধা, তুমি আমার হবে। একেবারে সম্পূর্ণ আমার।

কৃষ্ণের প্রগলভতা রাধাকে মুগ্ধ করেছিল। ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত তার অবস্থা। চোখ স্তিমিত। খুব করুণ

কৃষ্ণ তার দিকে আসছিল। আর সে বিস্মিত মুগ্ধ চাহনি মেলে কৃষ্ণের চোখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছিল। চাহনিটা তার কেমন বিচিত্র ঠেকল রাধার কাছে। কৃষ্ণের চোখে কি আছে জানে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, সকালের বৃষ্টি ধোয়া নরম রোদের আলোয় কেমন যেন গোটা পৃথিবীর রূপটাই বদলে গেছে। ভালো লাগল এই ভাষাহীন অতল স্তব্ধতার নির্বাক সবুজ সুন্দর পৃথিবী। এখানে সবই স্বপ্ন। নিজেকে মনে হয় তার রঙীন রূপকথার স্বপ্নময় জগতের বাসিন্দা। রাক্ষসপুরীর বন্দিনী রাজনন্দিনী আর কৃষ্ণ সাতসাগর তের নদীর পারের অচিন রাজপুত্র।

কৃষ্ণের দু'চোখে খুশির আভা। এই তার রাজ্য। রাধার মনে হল কৃষ্ণের দু'চোখে নিশ্চয়ই যাদু আছে। নইলে তার দর্শনে ও সান্নিধ্যে সব এমন মধুময় হয় কেমন করে? আনন্দের গভীর স্বাদে মন কেমন করে ভরে ওঠে? গহন অতল সমুদ্রের মত নীল দুই চোখের তারায় যেন নীল স্বপ্নপুরীর রাজ্য। একবার দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

কৃষ্ণের দু'চোখে বর্ষার সজল মেঘভারাবনত আকাশ সীমার স্তব্ধতা মাখানো। নির্বাক রাধা ভাষাহীনতার অনুভূতিকে অনুভব করেই সে মৃদু মৃদু হাসছিল। তার হাসির সুরেই যেন বনের পাখীরা মৃদু কলরব করে উঠল। এই নীরব অধরা রূপময়ী বনসীমার মতই তার অতলে মৌন একটা সত্তা আছে; সেও দুঃখ পায়, আনন্দের স্পর্শে সেজে উঠে। রাধার চোখে খুশির আভা ঝলকে উঠে।

কৃষ্ণের কণ্ঠে আনমনের সুর জাগল। স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে ডাকল : রাধা!

রাধা কথা বলতে পারল না। বুকের ভেতরটা থর থরিয়ে কেঁপে গেল। ভীরু চোখে কৃষ্ণের দিকে চেয়েছিল। তারপর মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে তাকে চলে গেল হাল্কা পায়ে।

কৃষ্ণ তার অকারণ খুশি আর প্রসন্নতার পানে চেয়ে নিজের মনে কি একটা হারানো সুর স্মরণ করে বলল: তুমি আজও

দৃষ্টিতে সে কৃষ্ণের দিকে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। তার মায়াবী মুখখানা যেন সীমানা ছাড়িয়ে চারদিককার আলোছায়ার মধ্যে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। চোখে জল এসেছিল রাধার। গাল বেয়ে টপটপ করে পড়ছিল।

কৃষ্ণ কাছে এসে দাঁড়াল। গালে হাত দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিল। রাধা বাধা দিল না। কিন্তু তার শরীরের ভেতর শিহরণ খেলে গেল। কৃষ্ণের হাতের স্পর্শে যে তার বুকের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনকে অনুভব করেছিল তা কৃষ্ণের আহ্বানেই রাধা টের পেয়েছিল। কৃষ্ণ মৃদু স্বরে ডাকল: রাধা!



সারাদিন কাজের ভেতর রাধা ছিল অন্যমনস্ক। তবু মুখখানা কি এক গভীর দুর্ভাবনায় যেন থমথম করছিল। ভাল করে কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। থেকে থেকে বুকভাঙা নিঃশ্বাস পড়ছিল।

রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় বাইরে দোচালার ঘর। ওখানে আয়ান কারিগরদের দিয়ে, দুধ থেকে মাখন, ননী, ঘি তৈরী করছে। রান্নাঘরেব বারান্দা থেকে আয়ানকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল রাধা। তার সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে মুক্তোর মত। তার ফরসা বুকে আর হাতে ছিল কোঁকড়া কোঁকড়া কালো লোম। ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। আয়ান মাঝে মাঝে তাকে আড়চোখে দেখছিল। ইশারায় কিছু বলতেও চাইছিল। একসময় জলপানের অছিলায় কাছে এল। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল:

বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে
লেহ-দাবানলে মন যে জ্বলে, হরিণী পড়িল ফাঁদে
নীল লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে ব্যাধ-শর নিল
বুকে।

কপট রাগে রাধা তার মুখখানা সরিয়ে দিল। বিরক্তিতে মুখখানা তার বেজার করে বলল: যাও, সব তাতে তোমার পরিহাস। মশকরা করার সময় পেলে না।

আয়ান কিন্তু নিরাশ হল না। থেমেও থাকল না। হাসি হাসি মুখ করে বলল:

শুনিয়া মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়
ব্যাধ-বাণ খায়্যা ঘাইল হইয়া
চারিদিকে যেন চায়।

রাধার কাজল কালো দুই ভুরু কোঁচকানো। চোখের চাহনি কিঞ্চিৎ ছোট হয়ে গেল। অরণ্যে হরিণীর অসীম মুক্তি, লীলায়িত গতি, দীঘল নয়নের অবোধ ভালবাসার আর্তি, ব্যাধের বানে তার আহত হওয়া মৃত্যু, রাধার, এ সবই রূপক। শরীর মন হঠাৎই চমকে ওঠল। সেই মুহূর্তে আয়ানের দিকে

ভাল করে তাকাতে পারল না। ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল। তাড়াতাড়ি আয়ানের মুখে হাত চাপা দিল। আয়ান কিন্তু তাতে নিরস্ত হল না। কথা বলার প্রবল ঝোঁক তখন পেয়ে বসেছিল তাকে। কিন্তু মুখের উপর রাধার হাতখানা চাপা থাকার জন্য কথাগুলো ভাঙা ভাঙা শোনাল। আয়ান বলছিল:

মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া।

রাধা চটে গিয়ে মৃদু ধমকের সুরে তিরস্কার করে বলল: কি যা তা আরম্ভ করলে? কেউ এসব কথা শুনে ফেললে কি ভাববে বলত? রসিকতার মাথামুণ্ডু নেই। সময় নেই, স্থান নেই—

আছে গো আছে। আমি তোমার বাইরেটা তো দেখি না। তোমার আত্মাকে দেখি।

কথাটা শুনে রাধার শরীর মন দুইই পুনরায় চমকে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে নিজের কাছে তার প্রশ্ন তবে কি আয়ানের চোখে ধরা পড়ে গেছে সে? ও কি সত্যিই তার আত্মাকে দেখেছে নিজের বুকের মধ্যে। মনের মধ্যে তার যে ঝড় বইছে তার অস্তিত্বের স্পর্শ কি লেগেছে ওর সমস্ত অনুভূতিতে? রাধার দাঁড়াতে আর সাহস হল না। রাগ দেখিয়ে সে চলে গেল জোরে জোরে পা ফেলে।

কিন্তু তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বুকে অনুশোচনার সমুদ্র। মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারল না। ঘরে থাকলে শুধু মনে হয় এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। সে আয়ানের সঙ্গে সত্যভঙ্গ করছে।

আয়ান ভীষণ ভালবাসে তাকে। কামগন্ধ নেই তাতে। ভালবাসা পুজোর ফুল। পুজারীর মত শুদ্ধচিত্তে তাকে নিবেদন

করে শুধু। আর কি আশ্চর্য সুখে ভরে যায় তার দেহ মন। আয়ান খুশি হয়ে বলল: এ হল আনন্দ সাগরে ভাসা। আমার মন ঐ জ্যোৎস্নার মত হয়ে গেছে। সমস্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে আমার প্রেম। আব তুমি টিপের মত জ্বলছ দূর আকাশে। তোমায় পেয়ে তারারা ঘুঙুর বাজছে, আর আমার বুকে তার তরঙ্গ দুলছে সমুদ্রের বুকে নৌকোর মতন। আমার সকল সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে ফুর ফুর বাতাসে। রাই, তুমি আমার মানস-সরোবর। কোন কিছু ভাবতে গেলেই মনে হয়:

আপনারে আমি দেখি গো মধুর রসে
তোমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

আয়ানের বচনে রাধার প্রাণ মন জুড়িয়ে গেল। এক অপ্রতিরোধ্য আবেগে তার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠল। তৃপ্তির সুখকর উল্লাসে তার দুই চোখ বুজে গেল। মুগ্ধ হৃদয়ে বলল: অমন করে বল না গো। আমার হাতে অরূপরতন দিয়ে, শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না আমায। আমি যে তোমাকে দুই হাতে পেতে চাই। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তোমাকে অনুভব করতে চাই। আমাকেও বলতে দাও, আমার সব আনন্দ তোমাকে নিয়ে।

আয়ানের দুই চোখে খুশি উপছে পড়ল। দুটি উজ্জ্বল চোখের ওপরে বাঁকা ধনুকের মত দুখানি ভুরুর রেখা যেন হাসছিল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল. রাই, আমাদের প্রেম তো স্বামী-স্ত্রীর নয়। দেব-দেবীর ভালবাসা।

আয়ানের মুখের খুব কাছে তার মুখ এনে রাধা স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঠোঁট আর চোখের পাতা তার কাঁপছিল। আস্তে আস্তে বলল: প্রিয়তম, আমরা কেউ দেবতা নই। মানুষ, বড় সাধারণ, ভঙ্গুর, বড় অসহায় মানুষ-মানুষী। স্বর্গে প্রেম নেই। আছে অনন্ত সুখ আর অনন্ত বিলাসিতা। দেব-দেবীর প্রেম আমি চাই না। মানুষের প্রেমে চরিতার্থ হতে চাই।

আয়ানের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি। রাধা ভয় পাওয়া কাঠবিড়ালীর মত তার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রইল। আয়ান তার অপ্রতিভ অবস্থার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল: শরীর যখন শরীরের উপর দখল নেয় তখন আর প্রেম থাকে না। সে হয় হিংস্র পাশবিকতা। পৌরুষেব আদিমতম কদর্য ঔদ্ধত্যকে প্রেম বলে না।

আয়ানকে শাপগ্রস্ত প্রস্তরীভূত দেবতার মত দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু তার কণ্ঠে অনুশোচনাজনিত প্রায়শ্চিত্তর আর্তি সান্ত্বনা বাণীর মত শোনাল। আযাল বলল: প্রেম পুজোর ফুল। আর সে ফুলের কীট হল কাম। কীট ফুলের শোভা নষ্ট করে, কাম প্রেমের মহিমা এবং গৌরব, স্বার্থে মলিন করে। আমার স্বপ্নের ঋষি অন্ধ কামনায় উন্মাদ হয়ে স্বর্গের লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠছাড়া করেছে। তাকে ব্যাভিচারের মধ্যে টেনে এনেছে। এ দুঃখ এ অনুতাপ মরে গেলেও আমার যাবে না।

ক্লান্তস্বরে রাধা বলল নিজেব হাতে তুমি যে ক্ষত এঁকেছ বুকের গভীরে, তার বেদনা আমার সারা অঙ্গে ও মনে। আমিও তোমার মত পড়ে আছি আহত হয়ে।

যা হবার তাতো হয়েই গেছে এ জন্মের মতন।

আয়ান রাধার মুখখানা পূজাঞ্জলি দেয়ার মত করপদ্মের মত ধরল। অনেকক্ষণ তার দুই চোখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দুই চোখ বোজা। কিন্তু জল টল টল করছিল চোখের কোণে। আয়ানের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। গম্ভীর গলায় ডাকল: রাধা। আমার দিকে তাকাও। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।

কথাটা রাধার বুকের ভেতর সপ্তস্বরা বীণার মত ঝং করে বাজল। তার সমস্ত চেতনার মধ্যে অনাহত স্বরে বেজে যেতে লাগল অনেকক্ষণ। সেই মুহূর্তের মনের ভাবটাকে বর্ণনা করার ভাষা ছিল না। তার সমস্ত শরীর মন জুড়িয়ে যেতে লাগল। নিজের মনই যেন তার সত্তাব কাছে প্রশ্ন করল, কি আর

চাইবার আছে? এখন যার যার জীবনের ভারে চাপা পড়ে মরার দিন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। এখন আর বলাবলি বা ভাবাভাবির আছে কি? এতো হল তার দুঃখের প্রতি, কষ্টের প্রতি আয়ানের সহানুভূতি, সমবেদনা জানানোর ভাষা। একটা মানুষ তার পবিত্র প্রেম ও আনন্দ নিয়ে, দুঃখ কাতরতা নিয়ে তার হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে যেন তার কাছে প্রশ্ন করছে। অকূলে পড়ে নিরুপায় হয়ে আর এক অসহায়ের কাছে সাহায্য চাওয়া যেন।

তবু রাধার মনে হল, সামান্য একটু কথা দিয়ে যে এত বড় সুধাসিন্ধু প্রাণেব মাঝে বইয়ে দিতে পারে তার মত বড় যোগী আছে কে?

আযান তাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। কথাটা আবার পুনরাবৃত্তি করল: বল, বল রাধা কি চাও? তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তোমাকে সুখী করা আমার কর্তব্য।

কথাগুলোর কি অসীম মাধুর্য! হৃদয়কে ফুলের মত মেলে ধরে, কিন্তু তার প্রকাশ একটুও ব্যাহত করে না। তার নিজস্ব গৌরবকে যথাস্থানে রেখে তার থেকে যতটুকু নেয়ার তা গ্রহণ করেই যেন চুকিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আয়ানের কথা বলার আশ্চর্য কৌশলটি চল্লিশ বছর বয়সে রাধা গভীর করে অনুভব করল। এ যেন সেই : থাক থাক নিজ মনে দূরেতে; আমি শুধু বাঁশিব সুরেতে পরশ করিব তার প্রাণ মন। একসঙ্গে নির্মম দূরত্ব বজায় রেখে অন্তরের গভীরতম স্থানে পৌঁছনোর কি এক আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করেছিল সেদিনের উক্তিতে। চল্লিশ বছর বয়সে সে কথা ভাবতে তার বিস্ময় লাগছিল। আয়ানের আবেদন সেদিন তার অন্তরে মহত্বের দীপটিকে উজ্বলিত করে দিল। তাই কি ভিতরটা এত অধীর হয়েছিল? রাধার স্পষ্ট মনে আছে সে কেমন আচ্ছন্ন হয়েগেছিল। তার সমস্ত সত্তা যেন ডুবে যাচ্ছিল ভাললাগার সমুদ্রে। দেহটা শিথিল হয়ে নুয়ে

পড়ছিল।

আয়ান তাকে দুহাতে বেষ্টন করে পালঙ্কে বসাল। একটি ছোট চৌকি নিয়ে তার পাশে বসল। তার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল:

তোমার কি আমাকে বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তাহলে, কিছু বলতে হবে না। বলার দরকার নেই। শুধু বল, আমি তোমার জন্য কি করব? আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করলে যদি সুখী হও তাই করব। তোমার জন্য আমি সব পারি। যে প্রেম শুধু শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসায় জড়ানো সেই প্রেম ত্যাগে সুন্দর। প্রেম কামে মলিন হলে বড় স্বার্থপর হয়। সে প্রেম শুধু দুঃখ ডেকে আনে। ভালবাসার স্বর্গীয় দীপ্তি ক'জনের জীবনে ঘটে? তোমার মত মেয়েই পারে মহৎ প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করতে। এখন তোমার মনের কথা অকপটে বলে তুমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাও।

রাধা কেমন যেন হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল: তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি যেন উড়ে যাচ্ছি মেঘের ভেতর দিয়ে। আমার দুধারে নানা রঙের প্রজাপতি উড়ছে। আমার পায়ের তলায় পড়ে আছে রৌদ্রতপ্ত ধরণী। ঐ মাটি আমায় ডাকছে। কিন্তু আমার দেহ হাল্কা হয়ে গেছে, আমি মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতে পারছি না, আমি শুধু উড়ে যাচ্ছি।

আয়ান খুশিতে গদগদ্ হয়ে বলল: দুঃখকে আনন্দ করার ভার মনের উপরে।



কিছুদিন থেকে ননদিনী কুটিলাকে নিয়ে বেশ একটা বড় বকমেব অশান্তি শুরু হল বাড়ীতে। সে রাধার চেয়ে ছ'বছরের বড়। তবু বন্ধুর মত ছিল। কুটিলার গায়েব রঙ আয়ানের মত ফর্সা নয়। মাজা রঙ হলেও দেখতে খাসা ছিল। সুন্দবী না হলেও হেলা-ফেলা করার ছিল না।

বাধার বিয়ের আগে থেকে একটি দবিদ্র মেধাবী ছেলে তাদের বাড়ী থেকে শাস্ত্র-বিদ্যা অধ্যয়ন কবত। নাম ছিল শতানন্দ। সে পড়াশোনায় খুব ভাল, দেখতে সুন্দর এবং অনুগত। জটিলার সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের সম্পর্কও ছিল। আয়ান জননী জটিলা ঠিকই কবেছিল শতানন্দের সঙ্গে কুটিলাব বিয়ে দেবে। এ বিয়ে স্থিব হয়েছিল কুটিলাব সাত বছর বয়সে। কিন্তু বিয়ে হল দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হলে। শতানন্দ ঘর জামাই

হয়ে থেকে গেল শ্বশুরালয়ে। দশ বছর হল কুটিলার বিয়ে হয়েছে। তবু তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। তাদের দাম্পত্যজীবনও সুখের ছিল না। নিত্য অশান্তি লেগেছিল। শতানন্দ কুটিলাকে সহ্য করতে পারত না। সে ছিল তার দুচোখের বালাই। কুটিলা ঘরে ঢুকলে শতানন্দ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেত। এমন কি শ্বাশুড়ীমাতা জটিলার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলত না সে। ডাকলেও জবাব দিত না।

পরিবারের মধ্যে রাধাকেই শ্রদ্ধা করত শতানন্দ। কথাবার্তা যা হয় তার সঙ্গেই। শতানন্দের ভাষায় সে হল মরূদ্যানের ফুল, তৃষ্ণাহরণের জল। কতদিন রাধার কাছে স্খলিত ভেজা গলায় অভিযোগ করেছে: বৌঠান, গরীব ঘরের ছেলে হয়ে জন্মানোর মত পাপ নেই। দারিদ্র্য আমার জীবনের অভিশাপ। কুটিলাকে আমার কোনদিন ভাল লাগেনি। কিন্তু এই পরিবারের প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতা ছিল। অন্নের ঋণ শোধ দিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি তাকে।

রাধা একটু অবাক হয়ে বলল: একথা বলা তোমার মত শিক্ষিত পন্ডিত মানুষের শোভা পায় না। একদিন তুমি তাকে ভালবাসতে।

শতানন্দের মুখখানা তীব্র বিতৃষ্ণায় এবং বিরক্তিতে ভরে গেল। তীব্র ঘৃণায় উচ্চারণ করল: ভালবাসা না ছাই! বেড়ালটা, কুকুরটা, গাছটা পর্যন্ত মায়াবশে আপনার হয়। কুটিলা সেই খোঁটায় বাঁধা মায়ার দড়ি। মায়া-প্রেম কখনও এক হয় না বৌঠান! এই বোধ আমার সেই অল্প বয়সে হয়নি। কিংবা হলেও মায়া-মোহবশে মানিয়ে নিয়েছি। ওষুধের মত চোখ বন্ধ করে গিলেছি! রোগের সঠিক ওযুধ না পড়লে যেমন হিতে বিপরীত হয়, আমারও তেমন হয়েছে।

কেন? কুটিলাতো খুব স্বামী-অনুরাগিণী। তোমাকে সব সময় খোশামোদ করে; সর্বক্ষণ পায়ে পড়ে আছে বললেই চলে, তবু তোমার মন ওঠছে না। নিজেদের মধ্যে এই বিরোধ

অশান্তি ডেকে এনে লাভ কি ভাই? তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, তাকেও কষ্ট দিচ্ছ। আর আমরা যারা আছি তোমাদের চারপাশে তারাও সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠা উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাচ্ছি। অশান্তি তৈরী করা কিছু কঠিন নয়। তার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই।

বৌঠান একটা মিথ্যেকে আর একটা বড় মিথ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় তখনিই বিবেকের বাধা থেকে এই অশান্তির উদ্ভব হয়।

প্রেম-ভালবাসা তো মায়ামোহ ছাড়া কিছু নয়। ঐ মায়া-মোহ কখন যে গভীর ভালবাসা, প্রেমপ্রীতি, সখ্য হয়ে পাহাড়চূড়া স্পর্শ করবে, অণু-অণু, তিল-তিল করে মায়ামোহের গর্ভে প্রেম জন্ম নেয়, কবে কি করে যে সে ভাব, প্রেম হয়ে উঠল শতানন্দ তুমি জানতে পারনি। তারপরেই গলার স্বরটা কেমন আবেগে কম্পিত হল রাধার। বলল: একটাই তো জীবন, এই জীবনকে নয়ছয় কব না। কোনও ছেলেখেলা কর না। তুমি অবুঝ হলে কুটিলার জীবনটাই কানা হয়ে যাবে। তুমি পুরুষ মানুষ। আব একটা বিয়ে করতে তোমার আটকাবে না। কিন্তু কুটিলার তো আর কোন উপায় রইল না। তুমি নিষ্ঠুর হলে বেচারীর জীবনটাই নষ্ট হবে। একটা জীবনকে এভাবে নষ্ট করার কোন অধিকাব কিন্তু তোমার নেই।

বৌঠান, কোন কিছুর ওপরেই মানুষের হাত নেই। আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কে জটটা বাঁধালো কিন্তু কুটিলা। বিশ্বাসের জায়গায তাব সন্দেহ, প্রীতির জায়গায় শত্রুতা, উদারতার জায়গায বিচ্ছিন্নতা; বোধহয় এই একটা কারণেই তার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে। এছাড়াও বিরোধ বেধেছে তার দেমাক আর অহংকারের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতাবোধের আর দারিদ্র্যের। আমি যে তাদের সংসারে আশ্রিত, তাদের কৃপা, অনুগ্রহ, দয়া পেয়ে বড় হয়েছি, মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছি সেই খোঁটাটা দিতে সে ভুল করে না। আমার

সবচেয়ে দুর্বলতার উপর সে নিষ্ঠুরের মতন চাবুক মারে। আমার দেহ-মন-আত্মা তার চাবুকের জ্বালায় জ্বলছে। সভাব এই নির্যাতনকে আর চোখে দেখতে পারছি না। তুমি ঠিক বলেছ বৌঠান, মানুষের জীবন একটাই! জীবনের সেই পবম জিনিস হল সত্তা আর মর্যাদাবোধ। আমার সেই সত্তা ভঙ্গুর আর টলমল।

শতানন্দের কথার মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ যন্ত্রণাবোধ রাধাকে স্পর্শ করে গেল। যন্ত্রণা যন্ত্রণাই। তার মধ্যে নৃশংস মধুর বলে কোন ভাগাভাগি নেই। সব কিছুরই একটা মানে থাকে। কিন্তু তার এই মন খারাপেরও একটা রহস্য আছে। রাধা কিছুক্ষণ নিজের যন্ত্রণায় নিজেই নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর সম্মোহিতের মত মুগ্ধ স্বরে বলল: তবু এই আমাদের জীবনের নিয়তি। এবং সংসারের গোয়ালে যার যাব খোঁটায় বাঁধা আছি। যার যা মুখের সামনে রাখা জাবনাতে অবোধ পশুর মত মুখ ডুবিয়ে জীবনের জাবনা খাচ্ছি। জান শতানন্দ, যে জীবন আমরা চাই, সব সময় কি পাই? কৈশোরে জীবনের যে স্বপ্ন দেখি, হাল্কা গোলাপী রঙে যে জীবনের ছবি আঁকি, সেই জীবন আমাদের মনোমত হল না বলে জীবনেব উপর প্রতিশোধ নেব, বিদ্রোহ করব কেন?

শতানন্দ হাসল। বলল: এ সমাজে আমরা কেউ বেঁচে থাকি না, বাঁচতে জানি না। সংস্কার, বিশ্বাস, কতকগুলো ঠুন্‌কো মুল্যবোধ, নীতিবোধ, লোকভয় আর অভ্যাসের দাসত্ব করি শুধু। আমরা বেশিরভাগ মানুষ প্রেমকে খুন করে তার রক্তে সত্তাকে রাঙিয়ে নিয়ে পুতুলের মত ঘর করি। সেখানে প্রেম নেই, বিশ্বাস নেই, ভালবাসা নেই,—শুধু প্রশ্বাস নিই আর নিশ্বাস ফেলি। এই কী জীবন? একে কি বেঁচে থাকা বলে? মাত্র একটা জীবনে, একমাত্র নিজেদের ইচ্ছামত বাঁচতে যারা না পারে তাদের মানুষ বলে না। মেনে নেয়া, সরে থাকা জীবনের ধর্ম নয়। বৌঠান, আমরা বোধ হয় মানুষ নই। তুমি

ঠিক বলেছ জাবনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খোঁটায় বাঁধা গরু। নিয়মবদ্ধ, মায়াবন্ধ। বৌঠান, এই মিথ্যে জীবনের বাঁধন ছিঁড়ে চল আমরা পালিয়ে যাই অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। পারবে? সাহস হবে কি পালানোর! বৌঠান, তুমি না গেলেও আমি পালাব। দুই হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কুটিলাকে চমকে দিয়ে আভীর পল্লীর ধুলো-বালি কাঁকর মাড়িয়ে বেরিয়ে যাব এই অন্ধকার গুহা থেকে। বন্যায় তেড়ে আসা জলের মত উন্মত্ত আনন্দে ধেয়ে যাব অবারিত পৃথিবীর দিকে।

রাধা মুগ্ধ দুই চোখে শতানন্দের দিকে তাকিয়ে থাকে। চিন্তাশূন্য সম্মোহিত। ভিতরে ভিতরে এক বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল তারও। অভ্যাসের বশে কণ্ঠে উচ্চারণ করল: কেন যাবে?

শতানন্দের দৃষ্টি দপ করে জ্বলে উঠল। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় যন্ত্রণার মোচড় দিল। চোখে জ্বলন্ত ক্রোধ জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল। বলল: এই বিরাট পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কীটেরও স্বাধীনভাবে শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে। মানুষেরও আছে। আমারও আছে। মানুষ ত কীট নয়, জন্তুও নয়। সে শুধু খেয়ে, ঘুমিয়ে আর রমণ করে বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের অনেক কিছুই থাকে, অনেক আনন্দ, দুঃখ, বেদনা থাকে যা শুধু মানুষেরই জানার কথা। কিন্তু যখন মানুষ মানুষের ভাষা বোঝে না তখন তার সঙ্গে বাস করা অর্থহীন হয়ে যায়। বৌঠান সন্ধ্যে হয়ে আসছে, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে; আমি এবার আমি যাই। খুশীতে ভরে উঠুক আমার খুশীহীন জীবন। আনন্দম্! আনন্দম্! আনন্দম্! বৌঠান খুশী হওয়াটা বড় কথা, —কি ভাবে, কোন্ পথে খুশী হচ্ছে তা জানার দরকার নেই। নিয়ে দিয়ে, দিয়ে নিয়ে সকলকে সুধন্য করে চলে যাওয়ার নামই জীবনের সার্থকতা। আমি সেই সার্থকতা খুঁজতে যাচ্ছি। বাধা দিও না, মায়া বাড়িও না। আমি যাচ্ছি—

শতানন্দ সত্যিই চলে গেল রাধার বিয়ের পাঁচ বছর পর। কুটিলাও বদলে গেল। সংসারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে

শতানন্দকে ভুলে থাকে। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে একা একা কাঁদে। কাউকে দেখলে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। কবে নাকি মথুরার পথে একবার দেখেছিল তাকে। কোন এক পানশালা থেকে ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বেরোচ্ছিল। তাকে দেখে কুটিলার ভেতরটা চম্‌কে উঠেছিল। কিন্তু তার এক মুখ দাড়ি, অবিন্যস্ত চুলে মস্তকটি বিরাট দেখাচ্ছিল বলে নিসংশয় হতে পারছিল না। লোকটির অবিন্যস্ত মলিন বসন, অসংলগ্ন পদক্ষেপ। বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখে সুরারক্ত দৃষ্টিতে কেমন একটা নেশার ঘোর। দৃষ্টি তার অতি নিস্পৃহ। মুখভাব দেখে মনে হয জীবনের উপর এবং বিশ্বজনের উপর তার একটা প্রবল অনীহা। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন অলস মন্থরতায়।

সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে পশরা নিয়ে কুটিলাও পথ দিয়ে চলেছিল। কিন্তু তাদের দলটি যখন খুব কাছে এসে পড়ল তখন হঠাৎ পথের পাশে থমকে দাঁড়িয়ে একটা পাগল যানবাহনকে লক্ষ্য করে বড় বড় অট্টালিকার উদ্দেশ্যে, মানুষজনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাত্রাদলেব কুশীলবের মত ঘুরে ঘুরে নানারকম গালিগালাজ, অশালীন বাক্য, অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করছিল। চেনা কণ্ঠস্বর শুনে কুটিলাও থমকে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গীরা যে যার মত চলে গেল। কুটিলা নিজেকে একটু আড়াল করে শুনতে চেষ্টা করল তার কথা।

শতানন্দ আঙুল নাচিয়ে চেঁচিয়ে সকলকে শোনানোর জন্য বলছিল: ভেঙে চুরমার করে দাও সব। কোন কিছুর জন্যই কারো কোনো মমতা নেই। আমি চাই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক। কিন্তু আমি একা বেঁচে গেলে কি হবে? একটু হেসে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল: কিছুই হবে না। আমার কোন জীবন নেই, আমারও কেউ নেই। আত্মীয় না, অনাত্মীয না, প্রভু না, ভৃত্য না— আমিও না। এই সুন্দরী শুনছ আমি স্বয়ম্ভু। কেউ বলতে পারে না, আমার কি আছে? তবে আমাব দুঃখ নেই,

থাকবে কেন বল? বাবা-মা আমার নাম খুব অঙ্ক কষে রেখেছিল শতানন্দ। আমার শুধু আনন্দ আছে। আনন্দ করব, মন্দ নিয়ে খেলা করব, গায়ে মাখব, মেয়েমানুষ নিয়ে নাচব, ভোগ করব, আদর করে মজা করব—অ্যাঁ।

কুটিলা শুনতে শুনতে বধির হয়ে গিয়েছিল। তারপর কচি ছেলের মত ককিয়ে কেঁদে উঠার স্বর বেরোল গলা থেকে। কাঁদতে কাঁদতে সে দৌড়ে গেল! শতানন্দ কুটিলাকে অমন করে পালাতে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল: যা বাবা, চাইতে এলাম একটু আনন্দ, বেটী কেঁদেই ঠান্ডা হয়ে গেল।

দূর থেকে কুটিলা আরো শুনল, শতানন্দের গলার স্বর। আরে ওই তো আরো একটা সুন্দরী যুবতী। সাজ দেখে মনে হচ্ছে নাগরের খোঁজে বেরিয়েছে। ওকেই একটু আদর করব।

কুটিলা মুখ ফিরিয়ে দেখল শতানন্দ সত্যি তার কোমর বেষ্টন করে হাসতে হাসতে চলেছে।

শতানন্দের গৃহত্যাগ ও অধঃপতনের জন্য সে দায়ী এই অনুশোচনা ভুলতে পারে না। আয়ানও তার অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না। ভাইয়েব মনোভাব কুটিলার অজানা নয়। কুটিলাও পারতপক্ষে তাব সামনে আসে না।

কুটিলা বেচারীর স্বামী থেকেও বিধবার মত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয় দেখে রাধার খুব কষ্ট হয়। হিন্দু মেয়ে সে। একবার বিয়ে হয়ে গেলে আর বিয়ে হয় না। তাহলে এখন বাকী জীবন ধরে কুটিলা কি করবে? একদিন এই প্রশ্ন নিয়ে সে এল রাধার ঘরে।

অবরুদ্ধ কান্নায় তার গলার স্বর ভাঙা। বলল: বৌঠান, এক নারীতে চিরজীবন আসক্ত থাকা বোধ হয় পুরুষের ধর্ম নয়। পুরুষ যা খুশী করে বেড়াতে পারে, আর আমরা নারী বলেই কি যত দোষ? মথুরা বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে মেয়েরা আজ বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে কেন? তাদের বিদ্রোহ সমাজের প্রতি, ক্ষোভ পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা আর অন্যায় জুলুমের

উপর। জঙ্গলের জীবনে তাই তারা ফিরে যেতে চাইছে, কেন?

কুটিলার কথা শুনে রাধা অবাক হয়ে গেল। এসব প্রশ্ন এমন গভীর আর জটিল করে তার মনে আগে কখনও ভেবে দেখেনি। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কি অগ্নি ও স্বাহার গল্প রচনা করেছে পুরাণকারেরা? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে আস্তে আস্তে বলল: তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেব এমন বিদ্যে বুদ্ধি আমার কৈ? পুরাণের একটা গল্প বললে তুমি বোধ হয় পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি ও স্বভাবকে বুঝতে পারবে। স্বর্গে, অগ্নিদেবতা আকাশময় একা একা ঘুরে বেড়াতে একদিন সপ্তর্ষির সাত স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তাদের রূপের ছটায় দশ দিক জ্বলজ্বল করছে। অগ্নিদেব মদনবাণে জর্জরিত হল। মনে তাদের প্রত্যেককে সম্ভোগ করার প্রবল বাসনা। সেই মত কুপ্রস্তাব পাঠাতে দ্বিধা করল না। কিন্তু সাধ্বী রমণীরা অগ্নির নির্লজ্জ, অসামাজিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তখন অগ্নি তাদের পাওয়ার জন্যে জঙ্গলে ধ্যান করতে লাগল। ধ্যানে যখন কিছুই হল না, তখন অগ্নি হতাশ হয়ে লজ্জায়, ধিক্কারে, অনুশোচনায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করবে বলে সংকল্প করল।

অগ্নির মনোবেদনা এবং দুঃখ দেখে প্রিয়তমা পত্নী স্বাহার ভীষণ কষ্ট হল। নির্লজ্জ স্বামীর মনোবেদনা লাঘব করার জন্য নিজের রূপ পরিবর্তন করে অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের সামনে এসে দাঁড়াল। মদনশরে জর্জরিত অগ্নি নিজস্ত্রী স্বাহাকে চিনতে পারল না। অঙ্গিরার স্ত্রী শিবা ভ্রমে তাকে প্রেম নিবেদন করল। আলিঙ্গন দিল এবং রমণ করল। অগ্নির চিত্তে কোন বিকার নেই। কামোন্মত্ত পুরুষকে ঠকানোর মত সহজ বোধ হয় আর কিছু নেই। নারীর এই মোহিনী শক্তির নাগপাশে পুরুষ চিরবন্দী। মায়াপাশে, মোহবশে আবদ্ধ থাকে। এই অভিজ্ঞতা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। নিজেকে প্রতারণা করার আত্মগ্লানি অগ্নিদেবকে মিথ্যাচারের শিকার করা

এবং শিবার নিষ্কলুষ চরিত্র ও তার পবিত্র সতীত্বের ওপর কলঙ্ক লেপন করার প্রবল দুঃখ ও কষ্টে স্বাহাব মর্মবিদ্ধ হতে লাগল। তার নিজের এই অনুশোচনার কোন সঙ্গী ছিল না। আত্মদহনে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছিল। কিছুতে ভুলতে পারছিল না, শিবা ভেবে স্বাহাকে অগ্নি যখন আদর করছে, চুম্বন করছে, আলিঙ্গন দিচ্ছে, অজস্র প্রলাপে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে তখন স্বাহার বুকের ভেতরটা দগ্ধ হচ্ছিল। পুরুষ জাতটার উপর তার প্রবল ঘৃণা জন্মাল।

নিদারুণ মর্ম যাতনায় স্বাহার দিন কাটতে লাগল। এই যন্ত্রণা, দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য সে ভাবল পাখী হয়ে উড়ে যাবে আকাশে। অথবা অন্য কোথাও। একা একা বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে ঘুরবে। তবু এই মিথ্যের পৃথিবীতে আর ফিরবে না। এখানে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, আছে শুধু লোভ-লালসা-ক্ষুধা। কোন পাহাড় চূড়াতে আশ্রয় নিয়ে সে যোগিনী হয়ে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবন। কিন্তু ভাবলে কি হবে? জাতে তো নারী। মায়া মোহ নারীর জন্মগত অভিশাপ। স্বাহা পারল না অগ্নিকে ছেড়ে যেতে। সপ্তর্ষির ছয় ঋষির স্ত্রীর রূপ ধরে নিত্য নতুন নারী হয়ে সে সন্তুষ্ট করতে লাগল অগ্নিকে। কিন্তু সর্বশেষ তেজবতী বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর রূপ ধরে এল না। স্বাহা হয়েই দেখা দিল। অগ্নিদেব তো তাকে দেখে বিস্ময় চমকে উঠল। বলল: স্বাহা তুমি? তুমি কোথা থেকে এলে এখানে? এই কুঞ্জে তোমাকে মানায় না।

স্বাহা অবিচলিত অকম্পিত স্থির দুই চোখে অগ্নির দিকে তাকিয়ে বলল: স্বামী, যাকে ইচ্ছামত কাছে পাওয়া যায়, যার ওপর সবরকম দাবি-দাওয়া অত্যাচার চালানো যায়—তার প্রতি তোমার এই উদাসীনতা, উপেক্ষাকে সইতে পারি না। নিজের স্ত্রীকে সহজে পাওয়া যায় বলেই বোধ হয় পুরুষের মন উঠে না। যা অধরা, যাকে পেতে গেলে অনেক মেহনত করতে হয় তার প্রতি তোমাদের পুরুষ জাতটার লোভ দেখে আমার

ঘেন্না হয়।

অগ্নি জবাব দিতে পারে না। মাথা হেঁট করে রইল। তাকে নিরুত্তর দেখে বলল: প্রভু একটা কথার সঠিক জবাব দেবে? সপ্তর্ষির ছয় ঋষি পত্নীর সঙ্গে রতিসুখে মত্ত থেকে যে সুখ তৃপ্তি আর আনন্দ তুমি পেয়েছ, সে কি স্বাহা তোমায় দিতে পারত না? স্বাহার হৃদয় দানের সাগর কিন্তু শুকিয়ে যায়নি। সে সমুদ্র মন্থন করলে তুমিও অফুরন্ত ঐশ্বর্যশালী হতে।

অগ্নিদেব ঝাঁঝাল গলায় উত্তরটা দিল: না। এক সঙ্গে রোজ ঘর করলে আর প্রেম থাকে না, ভালবাসা থাকে না। তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা অভ্যাসে গিয়ে দাঁড়ায়। অভ্যাসে একঘেয়েমি আসে। তাই বিয়ে করা বৌতে পুরুষের ক্লান্তি আসে। নারীরও আসে। কিন্তু তাদের মানিয়ে চলা প্রকৃতি, অভ্যাসকে স্বীকার করে নিয়ে প্রমাণ করে নিজেরা বেঁচে আছে। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতিটা একটু অদ্ভুত। সে বড় বেশী বন্য আর স্বাধীন। পুরুষের কাছে প্রত্যেকটি পরিচিত নারীর সঙ্গই ভিন্ন ভিন্ন রকম। কারণ প্রত্যেকের সত্তা প্রকৃতিতে কিছু কিছু বৈচিত্র্য পার্থক্য তো আছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন নারী তাকে আকর্ষণ করে। এতে তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়ম।

স্বাহা অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। সে হাসি থামতেই চায় না। অগ্নির কথাগুলো হাসির বন্যায় সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল: তুমি একটা আস্ত নির্বোধ। স্বপ্ন দেখতে সপ্তর্ষির স্ত্রীরা তোমার রূপে প্রলুব্ধ হয়ে আসবেই। মূর্খ, ছয় ঋষির স্ত্রীর রূপ ধরে এই স্বাহাই তোমার কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে। তোমার সঙ্গে সেই ভালোবাসা ভালোলাগার খেলা বেশ লাগছিল। কিন্তু অন্য একজন নারী ভেবে তুমি যখন আমার শরীরটা নিঙ্ড়ে নিচ্ছিলে, আমি তোমার শরীরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মেয়েমানুষ হওয়ার এক বিচিত্র লজ্জা অপমান আমাকে কষ্ট দিত। শুধু মনে হত, যে পুরুষ

নারীকে নর্মসহচরী করে পেতে চাইল, শুধু শরীর পাওয়ার জন্যেই যার এত কাঙালপনা সে কেমন করে শরীর ফেলে তার গলার স্বর, চোখের চাউনি দেখবে, হাতের স্পর্শ অনুভব করবে।

কুটিলা বোবার মতন মুগ্ধ চমক নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাধার দিকে। চোখের পলক পড়ে না মোটে। অনেকক্ষণ পর একটা বুকভাঙা নিশ্বাস পড়ল তার। তারপর আস্তে আস্তে বলল: জীবনে যা কিছুই পাওয়া যাক না কেন, সব কিছুর জন্য মূল্য ধরে দিতে হয়। আমাকেও মূল্য দিতে হবে। কথাগুলো বলতে বলতে সে রাধার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

কুটিলা চলে গেলে রাধা ভাবছিল, অগ্নি-স্বাহার গল্পটা সে করল কেন? এ দিয়ে সে কি বোঝাতে চাইল? কিন্তু এই কথাগুলো বলতে সে একটা ভীষণ সুখ পেয়েছে মনে। আজ আঠাশ বছর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সেদিনের ছবিটা চোখের উপব জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাধা। যুগল ভুরুর মাঝখানে সিঁদুরের টিপটি ধ্রুবতারার মত জ্বল্‌ছে। তার আঁচল কাঁধ থেকে খসে পড়েছে। বুক থেকে কাপড়টা সরে গেছে। কাঁচুলিবদ্ধ বুকের আশ্চর্য বক্ষসৌন্দর্যে সে নিজেই চমৎকৃত আর অভিভূত হয়ে যায়। ভুরু টান টান করে দেখল বাইশ বছরের অতুলনীয় রূপ আর উদগ্র যৌবনশ্রী। একটা প্রচ্ছন্নগর্ব অনুভব করল; প্রত্যেক নারীর ভিতরেই আছে এক মহাশক্তিরূপিণী দেবী। নিজের অনির্বচনীয় দেহসৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল: বিধাতার দান এই নারীদেহের রূপলাবণ্য ভোগ করার জন্য উন্মত্ত না হয়ে, দস্যুর মত লুণ্ঠন না করে, শ্রদ্ধা করতে শেখ অগ্নিদেব। স্বাহা তোমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। অমনি প্রফুল্লিত আনন্দের শিহরণ তার সারা শরীরে বয়ে গেল। নিজের মনেই গুনগুন করে গাইল:

যৌবন সরসী নীরে, মিলন শতদল,
কোন্‌ চঞ্চল বন্যায় টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌।



আঠারো বছর আগের ঘটনা। তবু কি আশ্চর্য, কি বিস্ময়—সেই অতীত এখনও তেমনি অক্ষয় এবং সজীব হয়ে আছে তার মনে। বিকেলে ঝুল বারান্দায় বসে সকলে মিলে গল্পগুজব করছিল। কেবল আয়ান এক কোণে একা, ছোট্ট এক চৌকির ওপর চুপ করে বসে। মাঝে মাঝে তার গাঢ় গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল বাতাসে। রাধা আয়ানের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার জন্য বেণীটিকে বাঁ কাঁধ দিয়ে নামিয়ে এনে বুকের দুই গোলকের মধ্যে দিয়ে দুলিয়ে দিল। বেলফুলের মালা জড়ানো বেণী এক আশ্চর্য সৌন্দর্য এনে দিল তার অঙ্গে। শ্রাবণের আকাশে বিদ্যুৎলতার মত দেখতে লাগল। কুটিলার বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় জ্বলে গেল। জ্বালা ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে কট্‌মট্ করে তাকাল। ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা গলায় বলল:

কত স্বামী সোহাগিনী আমার! তবু, না যদি জানতাম।

রাধা হাসল। এক ধরনের বিশেষ সহানুভূতি ছিল তার কুটিলার প্রতি। জটিলা কি করে জানবে, আয়ানের ভালবাসার ধরন কি? বন, নদী, পাহাড়, তারা, মহীরুহকে যেমন করে মানুষ শিশুকাল থেকে ভালবাসে অনেকটা সেরকম ভালবাসা। এই ভালবাসায় কোন দাহ নেই, আছে শুধু স্নিগ্ধতা। বোধ হয় একমাত্র' আযানের মতই ঋষিতুল্য মানুষ এরকম ভালবাসতে পারে।

কুটিলার কথায় রাধা সপ্রতিভ হয়ে বারান্দার এক কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। রোদ আর ছায়া দেয়ালা করছে। বিকেলে দিনের আলো নিভে আসছে। সব কিছু কেমন নরম আর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রশান্তি নামছে ধীরে ধীরে। নীড়ের পাখী নীড়ে আসছে অনেক মাঠ, গ্রাম পেরিয়ে। চুপি চুপি পা পা করে হাঁটছে ময়ূর-ময়ূরী। পায়ে পায়ে ধুলোয় ধুলোয় আকাশ ভরিয়ে দিযে ধেনুরা গোঠে ফিরছে।

জটিলা আয়ানেব খুব কাছে এসে নিচুর গলায় প্রশ্ন করল: হাঁরে, আজকাল তোকে ভীষণ বিমর্ষ দেখি। কেন বলত? বৌমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

কথাটা শুনে রাধা বিস্ময়ে চমকাল। কিন্তু সে যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই রইল। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় দৃঢ় হয়ে ওঠল তার শরীর।

আয়ান নিস্পৃহ স্বরে বলল: না, না, ওসব কিছু নয়।

দিন কাল ভাল নেই আর। বৃন্দাবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের যে একটা শান্তি ছিল তা আর নেই।

জটিলা ভাঙা গলায় বলল: থাকবে কি করে? নন্দের এই কেষ্ট ব্যাটাই গোলমাল পাকাচ্ছে।

সহসা অপবাধবোধে আয়ান চমকে ওঠল। ত্রাস্ত ও বিচলিত হয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল: না, মা—। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের আশীর্বাদ। তার নামে অপবাদ দিও না। সব দোষ কংসের।

কংস দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। তার সর্বদা ভয় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে। কিন্তু নিজের হাতে তাকে হত্যা করেছে। তবু সংশয় ঘোচে না, ভয় কাটে না। কৃষ্ণকে নিয়ে তার অকারণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। মনের ভিতর তার অসংখ্য জিজ্ঞাসা : কে এই কৃষ্ণ? এত শক্তি কোথা থেকে পেল? কৃষ্ণ তো সাধারণ শিশু নয়। আবার দেবকীর সন্তানও নয়। তথাপি এই শিশুকে উপেক্ষা করতে পারছে না সে। কৃষ্ণ তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

জটিলা দুচোখে বিস্ময়ের দীপ জ্বেলে বলল: এসব কি বলছিস বাবা? এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি।

আয়ানের অধরে মধুর হাসি ঝরল। বলল: কৃষ্ণের কথা শুনলে তোমার হৃদয় অস্থির হয়ে উঠবে। তুমিও জান অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত, শকটাসুর, পুতনা, কালীয়নাগ সকলেই কংসের বিশ্বস্ত অনুচর এবং অন্ধ সমর্থক। কৃষ্ণকে এরা গোপনে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু উল্টে শিশু কৃষ্ণের হাতেই প্রাণ হারাল। অবশ্য নিন্দুকেরা বলে বৃষ্ণিদের গুপ্ত সংস্থা অন্তরালে থেকে হত্যা করেছে এদের। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। তাই যদি হবে কংসের মত হিংস্র, নির্ভীক শার্দূল একটা ছোট্ট শিশুকে ভয় পায় কেন? কেন বিচলিত করে তাকে? আবার খুনী বলে একটা দুধের বাচ্চাকে কারাগারেও আটকে রাখতে পারছে না। শিশু কৃষ্ণকে বন্দী করলে কংসের গৌরব বাড়বে না, মর্যাদাও থাকবে না। তাই কংস নিরুপায় রাগে, আর অপমানে ছট্‌ফট্‌ করছে। হিংস্র রাগের জ্বালা জুড়োতে সে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার এবং জুলুমকে দিনদিন প্রবল করছে। সাধারণ মানুষকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ফন্দী করছে। কংস চাইছে, সাধারণ মানুষ কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলে, তাকে ত্যাগ করলে কৃষ্ণের সম্পর্কে উদ্বেগ দুর্ভাবনা কমবে। কিন্তু তার এই কূটনীতি ব্যর্থ হল। এখন তাই নতুন ফন্দী এঁটেছে। কৃষ্ণের যারা শক্তি এবং আগামীকালের ভরসা,

সেই বৃন্দাবন ও মথুরার তরুণ তরুণীদের এক উচ্ছৃঙ্খল, অসামাজিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতেই যত্রতত্র পানশালা তৈরী করেছে। সাধারণ মানুষ এর মন্দটা টের পাচ্ছে না। কিন্তু তার ভয়াবহতায় তাদের প্রাণ মন আলোড়িত। গোপালনবৃত্তি নির্ভর জীবনযাত্রায় দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো সহজেই মিটে যায়। প্রতিদিনের সাধারণ উদ্বেগ, দুর্ভাবনাগুলো সাধারণ মানুষের মনকে তত বিকল করে না। সারাদিন কায়িক পবিশ্রমের পর রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটায়। মনটা তাই এখনও আবিল হয়ে উঠেনি। কিন্তু এখন মথুরা থেকে, গিরিব্রজ থেকে কংসেব সমর্থনপুষ্ট বহু বণিক বহু বিচিত্র লোভনীয় আনন্দ উপকরণ নিয়ে ফলাও ব্যবসা করছে। পল্লীর নিরীহ সাধারণ মানুষ তার চাকচিক্য ও বৈচিত্র্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হচ্ছে। দেহোপসারিণী বহু নারীও নাকি সম্প্রতি বৃন্দাবনে এসেছে। উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর বৃন্দাবনের পুরুষ নারী সেই সব উত্তেজক আনন্দ ও পানীযের আকর্ষণে ছোটে। সারাদিন হাড়াভাঙা খাটুনির পর এই উত্তেজনা, আনন্দ তার সমস্ত অনুভূতিকে নাকি এক বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তখন নাকি স্বর্গসুখের সঙ্গে বাস্তবের কোন তফাৎ থাকে না।

জটিলা পানের একটা খিলি গালের মধ্যে পুরে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল: আমিও শুনেছি সন্ধ্যের পরেই নাকি পথের ধারে ধারে সুরার দোকান বসে যায়। আড়কাঠিরা আসে। তারা নাকি মন্ত্র জানে। পুরুষমানুষগুলোকে মন্ত্র দিয়ে ভেড়া করে আর মেয়েগুলোকে পরী করে খারাপ জায়গায় নিয়ে যায়। এমন আশ্চর্য কাণ্ড আগে কখনও ঘটেনি। ঘোর কলি।

আয়ান ভুরুটা কুঁচকে বলল: এদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই মা। ওরা আমাদের সন্তান। ঘরে খাবার নেই, ওদের সামনে নেই কোন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজে পায় না তারা। পাবে কোথা থেকে? আচার্য পণ্ডিতেরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যারা আছে তারাও

শিক্ষাদানে নিস্পৃহ। এরা না পাচ্ছে শিক্ষা, না পাচ্ছে জীবন ও জীবিকাব নিশ্চিন্ত আশ্বাস। এদের গোটা জীবনটাই অন্ধকাব ঢাকা। তাই আঁধারের রাজ্যে যে পাপ জমা হয়ে আছে তার মধ্যেই খুঁজছে মুক্তির আনন্দ আর জীবনের উল্লাস। তরুণদের পানাসক্ত হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ। কংসের রাজত্ব আমাদের জীবনের অভিশাপ। কাল ব্যাধির চেয়ে ভয়ংকর।

রাধা একটু চাপা গলায় সতর্ক করে দেবার জন্য বলল একটু আস্তে বল। চারিদিকে কংসের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বুকভাঙা শ্বাস পড়ল আয়ানের। বলল: তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দেশের কথা ভাবতে গেলে মনটা তেতে উঠে। কবে যে এই রাহুর দশা থেকে মুক্ত হব জানি না। প্রতিকারই বা কি তাও বলতে পারে না কেউ। অথচ সকলে আমরা মুক্তি চাইছি।

আয়ানের জন্যে জটিলার বুকটা কেমন করছিল। আয়ানেব মাথায় হাত রেখে তাকে আশা দেবার জন্য বলল: কেউ যদি না জন্মায় তাহলে মানুষের মুক্তি আসবে কি করে? পৃথিবীব ইতিহাস কি করে এগিয়ে চলবে? সৃষ্টির প্রয়োজনে বিধাতা তাকে ডেকে আনেন মর্তে। লোকে তাকেই বলে অবতার।

আয়ান কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়। রাধাও বিস্ময়ে বিভোর হয়ে জটিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল স্তব্ধ বিহ্বলতার ভিতর।

আয়ান স্তিমিত স্বরে বলল: মা, এত সুন্দর করে কথাটা তুমি বললে কেমন করে? পৃথিবীর ভূভার হরণের জন্য তাহলে সেই দেবতা এসেছেন মাটির স্বর্গে। মানুষের সে নারায়ণকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কমলাপতি আর কতকাল একা স্বর্গলোকে থাকবে? বিরহ সইতে পারেন না শ্রীহরি। তিনি যে সদা আনন্দময়। তিনি আনন্দম অমৃতম। আনন্দ ছাড়া একদন্ড থাকতে পারেন না তিনি। এক বিরাট জীবন স্রোতের অংশ হয়ে পরম ব্রহ্ম ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একা। ভীষণ একা। একা একা তাঁর ভাল লাগল না। রস পান না হলে, জীবনকে অতল

গভীরে মানুষের মধ্যে নিত্য নতুন করে অনুভব না করলে আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না। নিজেকে তিনি তখন দুই করলেন। তখন রূপ রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের একটা মানে খুঁজে পেলেন। মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হল এক নতুন বিশ্ব। বিশ্ব পৃথিবী জুড়ে এই সুর। সকলে মিলতে চায়, কেউ একা থাকতে চায় না। একা থাকার বড় কষ্ট। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ লক্ষ্মীবিরহ সইতে না পেরে এই মর্তের মাটিতে নেমে এসেছেন। বৃন্দাবনের মাটিতে পড়েছে তাঁর পায়ের ধুলো।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে জটিলার দুই চোখ চকচক করে উঠল। দুই চোখে বিস্ময়ের অতলান্ত গভীরতা। মুগ্ধ স্বরে বলল: তোর মুখে এসব কথা শুনলে মনটা কেমন দুর্বল হয়ে যায়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে। বড় ভাল লাগল রে। তোর স্বপ্নের সে নারায়ণ কে? তাকে একবাব দেখতে সাধ হয়। কিন্তু চর্মচক্ষে তাকে দেখব, এমন পুণ্য আমার আছে কি?

রাধা ডাক ভুলে যাওয়া পাখীর মত আয়ানের চোখে চোখ রেখেছিল। বুকে তার অশান্ত ঝড়। কেমন একটা উথলে ওঠা সাগরের মত ভাব। তবু একটা লজ্জায় কাঁপুনি ধরে গেল। বিব্রত ভয়ে সে গভীর এক দৃষ্টিতে আয়ানকে ভ্রূকুটি করে জটিলাকে বলল: জানেন না, আপনার ছেলে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে সকলকে বিপন্ন করতে এক ধরনের আনন্দ পায়। আপনি নিশ্চয় আমার চেয়ে সেকথা ভাল করে জানেন। আপনার ছেলের প্রসঙ্গে আপনার কাছে কিছু বলাতো মা'র কাছে মাসির গল্পের মত ব্যাপাব।

জটিলা হাসি হাসি মুখ করে আয়ানের দিকে চেয়ে থাকল। কিন্তু রাধার কথার প্রতিবাদ করল না। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল: সেটা তো ওই জানবে। তুমি কেন ওর মুখ চাপা দেবে?

ভীষণ চমকে ওঠেছিল রাধা। জটিলার শীতল কণ্ঠস্বর ঠাণ্ডা

বাতাসের মত তার সমস্ত সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। আয়ানের প্রগলভতাকে ভয় করছিল রাধা।

আয়ান মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল: যশোদার ছেলে গোপাল, আমাদের কানু, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সেই বৈকুণ্ঠপতি দীনবন্ধু।

রাধা সহসা কেঁপে গেল। তার চোখ ছলছল করে ওঠল। ঠোঁট কামড়ে বলল: সত্যি তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। কৃষ্ণকে তুমি অপমান করলে।

জটিলা একবার হঠাৎ একটু দিশেহারা বোধ করে চুপ করেছিল। তারপর একটু বিরক্ত হয়ে ধীর স্বরে বলল: বৌমা ঠিক বলেছে। তোর বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে।

আয়ান খুব হাসল। বলল: ছোট থেকেই একথা শুনে আসছি। তোমরা সবাই আমাকে একটু ভুল বুঝলে। কিন্তু আমার দেখায়, অনুভবে কোন ভুল নেই। শুধু তোমাদের ভ্রম ভাঙার জন্যই যা বলার আছে, বলছি। তোমার কিংবা রাধার তো অজানা নয়, জীবনে কখনও মিথ্যাচার করিনি, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়নি। তুমি কি বলতে চাও ভগবান স্বর্গের ধরাচুড়ো পড়ে মর্ত নেমে আসবে? ভগবানই এই মানুষের সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। ভগবানকে জানার জন্য চেনার জন্য তিনি আমাদের বোধ বুদ্ধি এবং বিবেচনা দিয়েছেন। তা না হলে অন্য প্রাণীদের থেকে অন্যলোক থেকে আলাদা করে দেয়ার সার্থকতা কি? আমাদের বিচারশক্তিই বা তিনি দিয়েছেন কেন? তোমরা চোখ বন্ধ করে সে অনির্দেশ অবাঙ্‌মনসগোচর বিশ্বনিয়ন্তাকে শুধু মনের মাঝে ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। কিন্তু মন দিয়ে বুঝতে চাও না, চোখ খুলে দেখতে চাও না তার অভিব্যক্তিকে। এই বিশ্বসৃষ্টির আদি অনন্ত স্বরূপ হয়ে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিরাজ করছে। তাঁকে শুধু চিনে নিতে হয়। খুঁজে বার করতে হয়। আচ্ছা মা, কৃষ্ণের মত মহান মহানুভবতা মানুষকে তুমি আর কোথাও দেখেছ? তার নিজের জন্য কিছু কামনা নেই। সে সকলের ভাল চায়, মঙ্গল চায়।

মানুষের শুভই তার কামনা। সে কামনা করে মানুষের মঙ্গল হোক, মানুষ ধর্ম, কর্মে সুন্দর হোক।

আয়ান কয়েকমুহূর্তেব জন্য থামল। জটিলার দুচোখে বিভোর বিহ্বলতা। বিস্ময়দীপিত দুটি চোখ মেলে সে আয়ানকে দেখতে লাগল। মা ও রাধাকে নিরুত্তর দেখে আয়ান বলল: কখনও দেখেছ কারো উপর তার কোন ক্ষোভ আছে? কোন খেদ আছে, তার কথায় মধু, সান্নিধ্যে মধুর। গোটা মথুরার মানুষ তার জন্য কাঙাল হয়ে ওঠেছে কেন? কি জাদু আছে তার ব্যক্তিত্বে? অবিশ্বাসের যুগে আমাদের কেউ কেউ তাকে মেনে নিতে পারে না। বিশ্বাস করতে পারে না; দেবতা কোন্ দুঃখে মানুষ হয়ে জন্মাবে? বিচার করে দেখ, মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, সুন্দর, সত্য আর শুভ তাই তো মানুষের দেবত্ব। ঐ দেবত্বটুকুই তার চরিত্রের শক্তি, অন্তরের সৌন্দর্য, নৈতিক বল এবং মানসিক স্থৈর্য। একমাত্র কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে আছে এই গুণ। তাই কৃষ্ণই পারে পৃথিবীকে স্বর্গ বানাতে। সে একা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, কংসের সমর্থনপুষ্ট হয়ে যারা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তাদের সে একা ধ্বংস করেছে। ভাবতো ঐটুকু ছেলেব কি বিপুল শক্তি, অসীম সাহস তেজ। গোটা মথুরাবাসী একত্রে কংসের বিপক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায়, অথচ কৃষ্ণ একা তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। কংস তার ভয়ে বিব্রত, অশান্ত। স্বর্গে ভগবান আছে কিনা জানি না, বিশ্বাসও করি না—কিন্তু মর্ত্যে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানের ঐশী শক্তি প্রত্যক্ষ করি। তুমি কি শোননি, কৃষ্ণ জননী যশোদা ননীচোরা গোপালের মুখে বিশ্বরূপ দেখেছে।

আয়ানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাধা বলল: আমি নিজে শুনেছি সেই অদ্ভুত গল্প। গোপাল মুখ ব্যাদান করেছে অমনি যশোদা সেখানে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র দৃশ্যের স্থাবর জঙ্গমের সব কিছু চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-পর্বত-নদী-সাগর-দিগন্তলীন অরণ্য আকাশ, পৃথিবী, ভূমণ্ডলসহ প্রাণী সব।

আয়ান তদগত হয়ে বলল : হ্যাঁ। অবিশ্বাসীব দল বলবে এসব মিথ্যে। কিন্তু যশোদার দেখা সত্য। তার অনুভূতি মিথ্যে নয়। মাতৃস্নেহের প্রভাবে জীবন ও বিশ্ব একাকার হয়ে যায়। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে তখন জননী আপন সন্তানের মাধুর্য ও লাবণ্যকে অনুভব করে। অসীম স্নেহ মমতার সূত্রেই হয়ত বিধৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার অনুভূতি। গোপালের বিশ্বরূপ জননীর কল্পনা। কিন্তু পৃথিবীর কটা মা সন্তানের মধ্যে তার আকাশ, তার পৃথিবী, তার ব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছে? কজন জননীর আমিত্ব সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে? কোনো মায়ের অন্তরে যে অনুভূতি কখনও জাগল না, যশোদার অন্তরে তার দর্শন পেলাম কেন? গর্গাচার্য বলেন, যশোদার এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। আমার এসব বিশ্বাস, অনুভূতি তোমাদের হয়ত ভাল লাগবে না। তোমাদের কাছে আমার এই উপলব্ধির কোন মানে নেই। তোমাদের চোখে আমি নির্বোধ, স্বপ্নবিলাসী। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আজ আমি সমস্ত লাভ-ক্ষতির বাইরে, সংসাবেব সমস্ত পাওয়া, না-পাওয়ার সীমা অতিক্রম করে কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হয়ে গেছি। আমার চোখে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"। আমি তার কিংকর মাত্র।



পঞ্চদশবর্ষী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর থেকেই কেবলই একটা আকাঙ্ক্ষা রাধার মনে জাগত। কৃষ্ণের সঙ্গে আবার দেখা হোক, কথা হোক প্রতিদিন এই ইচ্ছা প্রবল হত মনে। আর, নিজেই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করত কেন এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা? এর কারণই বা কি? এই অতৃপ্তির কোন নাম নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু প্রশ্ন করল "আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই?"

যত দিন যাচ্ছে, এই অতৃপ্তি লোকের চোখে প্রকট হয়ে উঠছে। রাধা বুঝতে পারছিল, কুটিলা, ললিতা, বিশাখা, বৃন্দের তাকে নিয়ে অনন্ত কৌতূহল। সব বুঝেও রাধা কিছুতে স্থির থাকতে পারছিল না। তার ঐ ঔদাসীন্যের গভীরে, তার

অতৃপ্তির মধ্যে যে মন বাস করছিল তার রূপ কেমন নিজেও জানে না। কিন্তু তার চার পাশে অতৃপ্ত আত্মার যে জ্যোতি ঠিকরে পড়েছিল তাই নিয়ে সখীদের রঙ্গ তামাসার অন্ত ছিল না।

বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাঁশীর মিহি মিষ্টি সুর কি এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে রাধার দেহমনকে ভরে দিচ্ছিল। ঐ বাঁশীর সুর যে তাকে ঘুমোতে দেবে না কৃষ্ণ জানে। কৃষ্ণ নিজে ঘুমোতে পারছে না, তাই রাধার চোখের ঘুম হরণ করছে। রাধা জানে ঐ বাঁশী কি চায়? তার ভেতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে। ঐ সুরের ছোঁয়ায় তার ভিতরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনটা যেন ডানা মেলে দিল কোন অতীতে। রাধা দেখতে পাচ্ছিল যমুনা তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে। আর কৃষ্ণ কদম্বমূলে বসে এক নিবিষ্টমনে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছে। তার কোঁকড়া চুলে পড়েছে সূর্যের আলো। রাধা তন্ময় হতে দেখল তাকে। কৃষ্ণের চোখ বুজে গেছে, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে। রাধার সমস্ত অন্তরটা ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, প্রেমে আপ্লুত হয়।

সারাপথ সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক। কি ভীষণ দরদ দিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছে। কানের পর্দায় বাঁশীর সুর বাজছে 'তুমি মধু, তুমি মধুর নির্ঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু।' আর তার সমস্ত শরীর মন যেন শিথিল আর অবশ হয়ে যাচ্ছে। চরণ স্খলিত হচ্ছে। আর সে বাঁশীব নিঃশব্দ সুরের মধ্যে কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। তার অবস্থা দেখে ললিতা বিশাখা অবাক বিস্ময়ে এ-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। হাসিতে তাদের মুক্তো ঝরে। রাধা ভ্রুক্ষেপ করে না। দুই ভুরু শুধু কয়েকবার কোঁচকাল।

ললিতা বিশাখা ভীষণ ঠাট্টা করে যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাদের রঙ্গ-রসিকতায় রাধা যোগ দিল না; চটেও গেল না। তাদের হাসি তামাসা উপভোগ করতে তার খারাপ লাগল না। এর ভেতর তার অবরুদ্ধ মনের কামনা, বাসনা ভাল লাগার

ইচ্ছেগুলো এবং আনন্দকে এমন করে পাচ্ছিল যে, মনে হল এই দুই সখী তার মনের বন্ধ দরজাটাকে হাট করে খুলে দিল! সখীদের হাসি-তামাসা-রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে যে এত আনন্দ আর সুখ লুকিয়ে আছে তা এতকাল কখনও এমন করে অনুভব করেনি। এই প্রথম টের পেল তাদের মজার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের আনন্দ ও সুখের একটা আশ্চর্য অনুভূতি তার মনকে প্লাবিত করে গেল। আর সে কেমন যেন হয়ে গেল। ভিতরটা তার ভীষণ অস্থির লাগছিল।

তবু রাধা নির্বিকারভাবে পথ হাঁটছিল। মাথায় কলঙ্ক। ললিতা রাধার গা ঘেঁষে হাঁটছিল। দুজনের বাহু এবং নিতম্ব উভয়কে ছুঁয়েছিল। ললিতা কানের কাছে মুখ এনে বলল: 'রাধার কি হৈল অন্তরের ব্যথা।'

রাধা কোন উত্তর দিল না। কষ্টে তাকাল বিশাখার দিকে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করা। চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখায়। ত'ব পরিষ্কার শ্বাস এসে লাগল বিশাখার গায়। বিশাখার চোখেমুখে হাসির ছটা ঝিলিক দিল। বলল:

নয়নে লেগেছে ভাল
তাই চোখে এত আলো।

ললিতা চপল হাসি হেসে রাধার চিবুকটাকে নাড়িয়ে দিয়ে নাচের ভঙ্গী করে বলল:

সই কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের নন্দন চাঁদ   পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।।
দিয়া হাস্য সুধা চার   অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেইকালে   পড়িল রূপের জালে
বাঁশী-ফাঁসি গলায় পড়িল।

রাধার মনের গতি পরিমাপ করতেই বিশাখা কাঁদ কাঁদ গলা করে বলল:

সজনী লো—
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে।
কর বাড়াইয়া যাই নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা।

বিশাখার কথা শুনে রাধা কেমন আনমনা হয়ে গেল। এই নিষ্ঠুর নির্মম প্রেমহীন পৃথিবীতে কারও বুকে যদি কারো প্রতি প্রেম, করুণা, দরদ, ভালবাসা থেকে থাকেতো তা আছে ঐ কানুর বুকে। সে কথা মনে হলে এক মহৎবোধে রাধার হৃদয় ভরে ওঠে। ললিতার রসিকতায় তাই সে একটুও উত্তেজিত হল না। তার মুখখানা সহসা লজ্জায় এবং এক নিষিদ্ধ ভাললাগায় লাল হয়ে ওঠল। মৃদু স্বরে বলল: যা পারি না, তার পাওয়ার সুখে মন রাঙিয়ে অসুখী করে দিও না। আমার স্বামী আছে। আমার জীবনের অশ্বত্থগাছ সে। তাকে নির্মূল করি এমন সাধ্য আমার নেই। তা ছাড়া করার কোন ইচ্ছেও নেই। যদি সেই গাছ কেটে ফেলি তবু তার শিকড় থেকে যাবে আমার মনের গভীরে। কোন মানুষকে তো সম্পূর্ণ করে পায় না কেউ। আমিও না হয় পেলাম না। মানুষ তো ইষ্টের ছবি দেয়ালে টানিয়ে হৃদয়ের সব নৈবেদ্য নিঃশেষ করে দেয়।

বিশাখার গলায় নূপুর পরা ঝর্ণার মত সুর বেজে উঠল।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো কেন
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,

নয়নে সাজায়ে মায়া মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।

ললিতা তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইল:

সখী, ভাবনা কাহারে বলে।
সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস রজনী "ভালোবাসা ভালবাসা"
সখী ভালোবাসা কারে কয়!
সে কি কেবলই যাতনাময়।
তাহে কেবলই চোখের জল?
তাহে কেবলই দুঃখের শ্বাস?
লোকে তবে করে
কী সুখের তরে এমন দুঃখের আশ।

তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে রাধা নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে দুই প্রিয় সখীর দিকে। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে তার মুখমণ্ডলে। জীবনে এই প্রথম নিষিদ্ধ ভালবাসার কথা শুনে সে অস্বস্তি বোধ করল না। বরং ভাল লাগল। বুকের মধ্যে সামান্য তরঙ্গ বয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও তার ভিতরকার যে সত্তাকে সে গলা টিপে ধরেছিল সহসা সেই সত্তাটা যেন চির নতুন হয়ে উঠল তার মধ্যে। স্বপ্ন থেকে চোখ মেলল জাগরণে। একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল সে। তারপর উজ্জ্বল হাসিখুশি মুখে সে ললিতার প্রশ্নের জবাব দিল সঙ্গীত দিয়ে।

আমার চোখে তো সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন।
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল—
সকলই আমার মতো,
তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়

হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত,
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে।
আয় সখী, আয় আমার কাছে
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।।

বিস্ময়ে ললিতা বিশাখা রাধার দিকে চেয়ে রইল। ঠোঁট চেপে ধরে মৃদু মৃদু হাসছিল। চোখেমুখে তাদের খুশির দ্যুতি ঝরছিল। কিন্তু এ কোন রাধা? যে প্রেমকে রাধা অন্তরে অনুভব করে তাকে কোন নামে শুধাবে ভেবে পেল না তারা। অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাহনিতে তার দিকে চেয়ে বলল: রাই পাহাড়ে, নদীতে, অরণ্যে, আকাশে যে শান্ত মধুর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি; বারবার হৃদয় ভরে উঠে আনন্দে সুখে এতো সেই প্রেম। সত্যি তোর কৃষ্ণ প্রেমেব কোন তুলনা হয় না। কৃষ্ণ শুধু তোর হৃদয়ে নয়, প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত। তোর হাসিতে, তোর গানে, তোর সখ্যে, তোর সব ভাললাগায়, চোখকাড়া সব দৃশ্যে, কানভরা সব সুরের মধ্যে সে আছে। এই সুন্দর পৃথিবী জুড়ে সে আছে। কৃষ্ণকে তোর হারানোর ভয় রইল না আর।

বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যায় বিশাখা। শূন্য চোখে সে ললিতার দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। ললিতা

ভ্রূকুটির মত নবম রোদের দিকে লোভীর মত তাকিয়ে আছে। ভেজা গলায় ললিতা বলল:

মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝাবে বাজিছে মধুব বাঁশিটি।



নিজের ঘরেব বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছিল রাধা। মনের মধ্যে তার দাহ। কুটিলা তাকে ভাল চোখে দেখে না। ঈর্ষা থেকে তার মনে সন্দেহ অবিশ্বাস জেগেছে। তাইতো রাধার চলাফেরার ওপর তার তীক্ষ্ণ নজব। কখন কোথায় যায়, কি করে এ সবের ওপর তাব দৃষ্টি আছে সর্বক্ষণ। জটিলার কানকেও সে ভারী করে তুলেছে। তাব মনকেও দিয়েছে বিষিয়ে। রাধা সম্পর্কে জটিলার মনেব ভিতর যে সুন্দব অনুভূতিগুলো ছিল কীটে কাটা ফুলের পাপড়ির মত তার দশা হয়েছে। রাধার মনেতে কষ্টের সীমা নেই। নিজের মনেই তার সংশয় জাগে। তবে কি

সত্যিই সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কৃষ্ণ তাকে নষ্ট করছে? কিন্তু কুটিলা একে নষ্ট বলছে কেন? কৃষ্ণ তাকে ভালবাসে। কৃষ্ণের মধুর আলিঙ্গনের মধ্যে যে এত গভীর সব আনন্দ লুকানো ছিল তা আয়ানের সঙ্গে বারো বছর ঘর করেও সে জানেনি কখনও। কৃষ্ণের সঙ্গে সুখের আনন্দে প্রায় পাগলই হয়ে উঠেছে ইদানীং। নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেলেনি কখনও এর আগে।

কুটিলার তাই মর্মান্তিক অভিযোগ: দাদার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তুমি গোল্লায় যাচ্ছ। বংশের সুনাম মর্যাদা আর তোমার জন্য রইল না।

রাধা কুটিলার বিষ সন্দেহের প্রত্যুত্তরে কিছু বলে না। কথাটা যে মিথ্যে নয় একেবারে, রাধার চেয়ে আর কে বেশী তা জানে? আয়ান মানুষটা বড় ভাল। ভারী সোজা সরল। শিশুর মত। ওরকম মানুষ হয় না। এরকম মানুষ অচল এ সমাজে। এদের নিয়ে ঘর করা আরো অসম্ভব। এরা না হতে পারে স্বামী, না হয় প্রণয়ী। এরা নিজের অযোগ্যতা আর অক্ষমতা শুধু লুকিয়ে বেড়ায়। পাছে নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে তাই নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে থাকে। যদিও ব্যাপারটা তাদের মানসিক। তাই ঠকাতে তাকে বিবেকে লাগে। কিন্তু সে যা করেছে তা ঠকানোর নয়। আয়ানের ধারণা তাকে বিয়ে করে পাপ করেছে, অন্যায় করেছে। অনুশোচনার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাধার কাছ থেকে সরে থাকে। আয়ানের সঙ্গে তার জীবনের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। যদি কিছু থাকে সে কৃষ্ণের সঙ্গেই আছে। তাদের খোলাখুলি মেলামেশা সম্পর্কে আয়ানের অনুভূতি প্রতিক্রিয়া এটুকুই। কৃষ্ণের মত অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, দীপ্ত তারুণ্যে ভরপুর এক মহাপ্রাণ প্রেমিক তার জীবনে বড় বেশী দেরি করে এসেছে। তার ও আয়ানের জীবনে সেটাই দুর্ঘটনা। নইলে, জীবনটা অন্যভাবে সুরু হত। এই অঘটনের স্মৃতিতে তার মন ভারাক্রান্ত। আরো আগে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে পদার্পণ করা উচিত ছিল। তাহলে রাধার নিজস্ব চাওয়া, নিজস্ব

বন্ধু এবং নিজস্ব জগৎ বলতে যা বোঝায় তা আরো আগে লাভ হত।

মনে আছে, কুটিলা আয়ানকে সরাসরি স্পষ্টভাষায় বলেছিল: ঘরের বৌ-র বেলেল্লাপনার জন্য দায়ী তুমি। তোমার কাছ থেকে সাহস পেয়েই ও এত বেড়েছে। লজ্জা, সম্ভ্রমের মাথা খেয়েছে। গুরুজনের সামনে বেহায়ার মত মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে তার লজ্জা না থাকতে পারে. কিন্তু আমাদের তো আছে। তোমার আস্কারায় বৌ-মনি মাথায় উঠেছে। তুমি তাকে দেবী করে রেখেছ। কিন্তু দেবীর কোন্ গুণ ওর মধ্যে আছে? তোমার ভালমানুষীর কোন মূল্যই ও দেয়নি। পড়ে পড়ে এই পরিবারের এবং কুলের গৌরব, সম্মান শুধু খুইয়েছে। এখনও বিহিত করতে পার না? তুমি কি পুরুষ?

আয়ানের মুখে হাসি, চোখে কৌতুকের ছটা। কুটিলার অভিযোগে সে রাগ করল না। কুটিলাকে শান্ত করার জন্য মৃদু স্বরে বলল: বিয়ে মানে কি কয়েদ খাটা? শ্বশুরবাড়ী কি কয়েদখানা! বিয়েটা বেঁচে থাকার একটা জরুরী শর্ত। সে শর্ত পূরণ করার অর্থ ব্যক্তিসত্তার দাসখত লেখা নয়। একবার একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, সব কিছু ফুরিয়ে গেল কিংবা নিঃস্ব হয়ে গেল সে তো আমি মনে করি না। জীবন হল 'আনন্দ-রূপম্ অমৃতম্', এই আনন্দের স্বরূপটাকে আমরা বুঝি না, চিনি না বলে যত গন্ডগোল বাধে। আনন্দের স্বরূপটা জলের মত। জলের নিজস্ব কোন বর্ণ নেই। আনন্দের রূপও তেমনি চোখে দেখার জিনিস নয়। জল যে পাত্রে রাখবে, সেই পাত্রের রঙেই তাকে দেখবে। কিন্তু তাতে জলের বর্ণের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কেবল পাত্রের জন্য তাকে আলাদা দেখছ। পাত্রভেদে আনন্দের রূপও আলাদা। ভালবাসার অনুরাগের ভিতর দিয়ে তো সেই আনন্দের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে। পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ, পুত্রের বিরহে মাতার বিলাপ. সখার জন্য সখার অসীম ব্যাকুলতা. প্রভুর প্রতি দাসের সেবা, নায়িকার

প্রতি নায়কের প্রগাঢ়, প্রীতি, কিংবা নায়কের জন্য নায়িকার প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, বিরহ—এ সবই তো পাত্রভেদে আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

কুটিলা বেশ ঝংকার দিয়ে বলল: উঃ তুমি কিচ্ছু বোঝ না। তোমাকে বোঝানোও দায়। বৌ-মণি তোমাকে যাদু করেছে।

আয়ান মৃদু মৃদু হাসল! বলল: ওরে, মানুষ মাত্রেরই কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে। সেই ব্যক্তিসত্তা তার একার। সম্পূর্ণ নিজের। আমাকে দিয়েই বোঝ না, তোর বৌ-মণির জীবনের কতগুলো বছর, কত অমূল্য জীবনের সময় আমি নষ্ট করে দিয়েছি। এখনতো সেগুলো ফেরানো যাবে না। অথচ, সে মুখ বুজে এই সংসারের জন্য তার যেটুকু দেবার নিঃশেষে দিয়ে গেছে। তার কোন ঋণ জমা হয়ে নেই। উদ্বৃত্ত বলতে যদি কিছু তার থেকে থাকে, তা যদি নিজের পছন্দমত অন্য কাউকে দেয় তাতে তো কোন দোষ নেই। তা নিয়ে আমিই বা ঈর্ষা করতে যাব কেন? মন দেয়া নেয়াতো কারো দয়ার নয়, কোন এক পক্ষের ঘৃণারও নয়। কিংবা দু পক্ষের উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীনতারও জিনিস নয়। এটা হল জীবন! জীবনকে নিয়ে শতানন্দ পাগলামি করেছে, তুই পুতুলখেলা করেছিস। কিন্তু রাধা অনন্য। সে বুঝিয়ে দিয়েছে জীবন মানে আনন্দ। দু পক্ষের তীব্র আসক্তি আর আবেশে ভর করে আসঙ্গর আনন্দঘন আশ্লেষে একে অন্যকে সম্পূর্ণ করে না পেলে যুগল মনের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজানো আর ধূপ জ্বালানো হয় না। প্রকৃত পুজো তখনই হয়। আমার জীবনে রাধাকে না পেলে এমন করে জীবনের অর্থতো কখনও বুঝতে পারতাম না। রাধা মানে আনন্দ, রাধা মানে প্রেম—রাধার অপর নাম হল জীবন। প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, তেমনি জীবনের কামনা বাসনা আনন্দের বুকে রাধা প্রদীপ শিখা হয়ে জ্বলছে। কিন্তু সেজন্য শরীরে কোন দহন নেই তার। প্রেমের আনন্দের স্নিগ্ধ মাধুরিমায় ভরে আছে তার বুক। তাই তো রাধাকে সংসারময়

দেখি। এই বৃন্দাবনে রাধা ছাড়া আর কি আছে জীবনে?

কুটিলা বলল: তোমার কথাগুলো শুনলে মনে হয় স্বর্গ পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তুমি চিরদিন স্বপ্ন দেখে কাটালে। মাটিতে পা ফেলে চললে না কখনও। তাই টের পাওনা সমাজ আছে, আত্মীয়-কুটুম্ব আছে। এদের চোখে তো বৌ-মনি ভ্রষ্টা, একটা নষ্টা মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নয়। স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষকে ছুঁতে নেই! মন চাইলেও সে তা করতে পারবে না বলেই তো সমাজ।

দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রাধা কথাগুলো শুনে চমকে ওঠেছিল। ঘরের ভেতর একটা প্রদীপ জ্বলছিল। তার ক্ষীণ মৃদু আলো প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত ঘরখানি একটা ছাইরঙা মথের ডানার মত তির তির করে কাঁপছিল। বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা অনুরূপ দপ্‌দপ্ করছিল। রাধা ফিরে যাওয়ার জন্য মুখ ঘোরাল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল আয়ানের গলা। বলল: ওরে শরীরের নগদ দাম কতটুকু? মন যদি না চায় শরীরটাকে বেঁধে রাখলেই কি সে সতী হয়ে গেল। মনটাই তো সব।

আয়ানকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে কুটিলা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু আয়ানের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়ানোর অবস্থা ছিল না রাধার। তার মনেতে দ্বিধা, সংশয়ের যন্ত্রণা। কুটিলার কথাই ঠিক ভাবল। সে আর সতী সাধ্বী নয়। মনের দিক থেকেও দ্বিচারিণী। দেহের শুচিতাই বা কোথায়? কৃষ্ণকে সে আলিঙ্গন দিয়েছে, তার অধরসুধা পান করেছে। দেহে-মনে সে কি খাঁটি আছে আর? আগে ভাবত অবহেলায়, ঘৃণায়, বিরক্তিতে, প্রয়োজনে যাকে তাকে মেয়েমানুষ শরীর দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু মনের ভালবাসা দেয়া যায় এক জীবনে একজনকে। কিন্তু সে কি আয়ানের মনের ভালবাসা পেয়েছে কখনও? আয়ান তাকে মানবীর চোখে দেখে না। তার কাছে সে স্বর্গভ্রষ্টা দেবী। মানুষী ভালবাসায় সামান্যতায় এবং

সীমাবদ্ধতায় কোনদিন রাধাকে টেনে এনে তার মনকে. দেহকে আবিল করে দেয়নি। পূজায় স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে নিজেকে শুধু নৈবেদ্য দিয়েছে। শরীর পাওয়ার জন্য ফুলশয্যা রাতের কাঙালপনাটুকু ঘুমের মধ্যে তার পূজার ফুল হয়ে ওঠল কেমন করে সেই বিস্ময় রাধার মনকে ছুঁয়ে আছে। আয়ানের এই অদ্ভুত ঠান্ডা দ্বেষহীন, ঈর্ষাহীন প্রেম ও ব্যবহাব তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। প্রতিকারহীন যন্ত্রণা বড় ধাক্কা দেয় তাকে।

কিন্তু কৃষ্ণ না থাকলে রাধার কি হত তাই শুধু ভাবে মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে কৃষ্ণকে নিয়ে যখন ঝড় ওঠে তখন পরিবেশ, জীবন, জীবনযাত্রা সব কিছু সম্বন্ধেই বড়ই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে একটু বসলেই কিংবা তার একটু দেখা পেলেই যেন সব শান্তি ফিরে পায় মনে। কৃষ্ণ যেন তাকে নতুন প্রাণ এনে দেয়। ফুরিয়ে যাওয়া রাধাকে নবীন করে তোলে।

কৃষ্ণের চিন্তাটা রাধার মনে এক অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতির শিহরণ ছড়িয়ে দিল। সে কিছুতে তার অনাস্বাদিত পূর্ণ আনন্দ ও মুগ্ধতাকে ভুলতে পারছিল না। তার সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার ঘ্রাণ, তার তৃপ্তি ও আনন্দের দ্যুতি।



কৃষ্ণের বাঁশীর সুর এমনভাবে কানে, হৃদয়ে বসে যায় যে, সেই সুর জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। কিছু মুহূর্ত, কিছু অনুভূতি, কিছু স্মৃতি সেই সব সুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে গেঁথে যায় বিনিসুতোর মালায়। মধ্যরাতের বাঁশী সেই সুরের রেশ বহন করে আনল মনে। অমনি আকুলি-বিকুলি করে ওঠল তার মনের ভেতরটা। রাধার সমস্ত মনটা, বুকের ভেতরটা কেমন পাগল পাগল লাগে।

কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে যমুনা। তার একটানা ছলছল শব্দ আর কৃষ্ণের মোহন মুরলীধ্বনি তাকে আনমনা করে দিয়েছিল। নিজের অস্তিত্ব, স্বামীর অস্তিত্ব, স্নিগ্ধ প্রশস্ত নিঃসীম রাতের অস্তিত্ব সবই তার চোখের থেকে চেতনার মধ্যে থেকে সুরের

মতই অনেকদূব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল। সে তাব অবচেতনে, অতীতের, তাব যৌবনেব চব্বিশ বছর বয়সে ফিরে গেল অনেকগুলো বছরকে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে।

রাধার অভিমান হয় কৃষ্ণকে কেউ খারাপ বললে। কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন দুর্নাম অভিযোগ, নিন্দে সে সইতে পারে না। চোখে জল এসে যায়। স্নানরতা নারীর বক্ষ সৌন্দর্য, অনাবৃত দেহলাবণ্য অথবা অসংবৃত বস্ত্রের অন্তরাল থেকে প্রকাশিত গোপনাঙ্গ দেখার প্রলোভনে কৃষ্ণ নদীতীর সংলগ্ন কদম্বমূলে বসে মুরলী বাজায় এই কথা কুটিলার মুখে শোনা থেকে ঘৃণায় তার গা রি-বি করছিল। সমস্ত অন্তঃকরণ তার ছিঃ ছিঃ করে উঠল। অমন অদ্ভুত কৃষ্ণ যে শুধু মানুষের ভাল চায়, তার শুভ কামনা করে, যার অন্তঃকরণটা অতবড় সে এত ছোট হীন কাজ করবে কি করে? কৃষ্ণের মহৎ মানবিকতা উদার আদর্শবাদের আলো এসে পড়েছে গোটা মথুরাবাসীর জীবনে। তার সান্নিধ্যে ছোট ছোট মানুষও কিছু বড় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী পুরুষ সবার সামনে বড় হবার অপূর্ব সুযোগ এসেছে। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মহান সাহসে তারা বড় হয়ে গেছে। আজ অগৌরবের কালিমায় সেই কৃষ্ণেব জীবনকে এমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিল কে?

সুন্দরী রমণীরা মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করে, তাদের সাধমা সংযম ভাসিয়ে দেয়। কৃষ্ণ সামান্য যুবক। এই বয়সে কোন শাসন নিয়ম মানে না। এই বয়সের তরুণ তরুণীর কৌতূহল একটু বেশী উগ্র আর অসংযত। কিন্তু কৃষ্ণ তো সাধারণ মানুষ নয়। রাধার বিশ্বাস প্রবল সংশয়ের অস্তিত্বকে প্রচণ্ড ধাক্কায় নিমেষে বহুদূরে সরিয়ে দিল। কৃষ্ণের কলঙ্কের তাপে তার মন পুড়লেও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার দহন। কোন অজ্ঞান সম্মোহনের তন্ময় প্রভাবে সে কাটিয়ে উঠল তার ব্যথা। চাঁদের কলঙ্ক তার গৌরব, তেমনি এই কলঙ্ক কৃষ্ণের গৌরবকে কেমন করে

মেলে ধরবে ভেবে আকুল হল রাধার অন্তর।

লোকে যাই বলুক রাধা তার ধ্যানের দেবতা, মানুষেব মঙ্গলদূত সম্পর্কে ঐ ধরনের কোন কুৎসিত চিন্তা কখনো কল্পনাও করতে পারে না। করতে গেলে তার বিবেকে বড় আঘাত লাগে, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব: মন্দকে বিচার না করে সহজে বিশ্বাস করা, খারাপটাকে সে ডুব দিয়ে তুলে আনে।

বৃন্দাবনের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা আছে, তা বলে সেই স্বাধীনতা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ আচরণ করে রমণীরা নিজেদের অসম্মানের পাত্র করে তুলবে একথা মানতে, বিশ্বাস করতে রাধার মন সায় দিল না। স্বাধীনতা মানে রুচিহীনতা, শালিনতাহীনতা কিংবা কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বিবেকহীনতা নয়।

গোপনারীরা নিরাবরণ হয়ে সরোবরে স্নান করে একি বিশ্বাস করার মত ঘটনা? কোন সভ্য মানুষ এরকম অসম্ভব চিত্র কল্পনা কবতে পারে মানুষ ভাবতেও পারে না। নিজেকে শুধু অনাবৃত করা সম্ভব দুয়ার রুদ্ধ স্নানের ঘরে। একমাত্র স্নানের ঘরে দর্পণের সামনে নিজেকে নিরাবরণ করে শরীরের সঙ্গে কথা বলা যায়। এই শরীরটাই যে জীবনের সব। একে নিয়ে গর্ব, অহংকার, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা। শরীরের মধ্যে তাব জীবনদর্শন হয়। এ হয়তো নিজেকে ভালবাসা কিংবা অন্বেষণের এক ধরনের প্রকাশ। একমাত্র স্নানের ঘরে আয়নার সামনে নিরাবরণ হয়ে কাঁদা যায়, হাসা যায়, নিজের গবির্ত অথবা হীনমন্য নিজস্বতাকে নির্দ্বিধায় প্রতিবিম্বিত করা যায়, ক্ষমা পাওয়া যায়। দর্পণ ছাড়া মানুষের বোধহয় কেউ এত আপন নয়।

কিন্তু স্নান ঘরের বাইরে উন্মুক্ত সরোবরে দিবালোকে নিরাবরণ হয়ে একজন বারবণিতাও স্নানে লজ্জা পায়। লজ্জার কারাগারে বন্দী গোপরমণীরা দুর্লভ লজ্জা কেমন করে ত্যাগ

করল রাধার মাথায় ঢুকল না। যত ভাবে তত মনে হয় কুটিলা ঈর্ষায়, ক্রোধে, উন্মাদ হয়ে কৃষ্ণ-নামে কলঙ্ক লেপন কবছে।

মনটা অনেকদিন ধরে ভাল ছিল না। কেউ কাছে থাকলেও ভাল লাগত না। শরীরের ভেতর একটা যন্ত্রণার মত কিছু টের পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে ললিতা বিশাখার কৌতুকের অন্ত ছিল না। তাদের ঠাট্টা তামাসা, রসিকতাও পারে না তার নির্লিপ্ত কাঠিন্যকে বিদীর্ণ করতে। আসলে তার কিছু ভাল লাগছিল না। নিজের সব ভাবনার কথাতো অন্যকে বলা যায় না। বলতেও নেই। লাভ হয় না কোন। এক-একজন মানুষের ভাবনা এক এক স্তরের। একই আকাশে নানারঙের মেঘ যেমন হয় অনেকটা সে রকমই।

মথুরার হাটে পশরা নিয়ে যাচ্ছিল। সহসা আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। ঘুঘুর ডাকটা মেঘাতুর বিষণ্ণতাকে দ্বিগুণ করল। বেশ একটা ঠান্ডাভাব হল। ঝিরঝির করে উত্তরে হাওয়া বইতে লাগল। কদম গাছের পাতারা কেঁপে ওঠল। রাধাকে অন্যমনস্ক আর উদাসীন দেখে ললিতা স্বগতোক্তি করে বলল: ব্যথা আমার কুল মানে না। বাধা মানে না—পরাণ আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।'

বিশাখা রাধার যন্ত্রণাকাতর মুখ, নিশ্চল চাহনির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাধাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল: বড় জ্বালা সখী এ বুকে! প্রেমে পড়লে এত যে মন পোড়ে, জানা হল এখন। আমার পোড়া কপাল!

ললিতা বিশাখাকে কটাক্ষ করল। বলল: প্রেমিক প্রেমিকাদের কত কষ্ট হয় তা হলে!

বিশাখাব দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হা-হুতাশ করে বলল: মনের কষ্ট শবীবের কষ্ট। বুক হু-হু। আরো কত সব উপসর্গ।

ললিতা অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল: আশ্চর্য। তার পরেই সকৌতুকে নিজের মনে ভেঙে ভেঙে আবৃত্তি করে বলল:

মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।

দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে।।
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন্ন বলিয়া।।

বিশাখা রাধার তন্ময়তা ভঙ্গ করার জন্য কপালে করাঘাত করে কান্না কান্না গলায় সুর করে গাইল:

হায় অভাগিনী পরের অধীনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি পরাণ পোড়নি
ঠেকিনু পীরিতি রসে।।
অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে না নিঃসরে কথা।
মোর সখীর মুখ করুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা।

তারপর সে হাসি হাসি মুখ করে খুশিতে ডগবগ হয়ে বলল: ভালোলাগা ভালোলাগা খেলাটাই বেশ। ভালোবাসা, প্রেমে পড়া এসব সাংঘাতিক রোগ। অতি বড় শত্রুও যেন এরকম প্রেমে না পড়ে।

রাধা প্রেমের যন্ত্রণায় বুঁদ হয়েছিল। সখীদের কোন কথাই তার কানে পৌঁছল না। কলের পুতুলর মত সে হাঁটছিল। মনটা তার শরীরের ভেতর ছিল না। কৃষ্ণের কলঙ্কের ভাবনা তাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল।

বৃষ্টি থামল না। কালো মেঘ উড়ে গেল। কিন্তু বেশ একটা ঠান্ডা ভাব নিয়ে এল মুক্তিব স্বাদ। শাল, সেগুনের শাখা প্রশাখায় শীত শীত নরম রোদের ছোঁয়া লেগেছে। লাল মাটির পথ থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওঠে আসছে। আর তার ছায়া ছায়া রোদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে মুখ বুজে সে হাঁটছে। স্নিগ্ধ নীল দীপ জ্বালানো লালের ছোঁয়া লাগা পুবেব আকাশের রঙ জল-স্থল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, ওরা যেন মর্তলোকের কেউ নয়।



রাধাব বুকের ভেতরটা সহসা কেঁপে গেল। এক অবিস্মরণীয় অতীতকে তার মনে পড়ল। হঠাৎ চল্লিশ বছরের এই গণ্ডীটাকে এক নিমেষে পার হয়ে গেল। তার দৃষ্টি বর্তমানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বহু দূরে চলে গেল। সহসা তার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি কালের কোন ক্ষয় নেই? কাল কিছুই ধ্বংস করে না? পুরনো করে না? পুরনোকে নতুন করে সৃষ্টি করে। জীবনটা তার পুরনো হয়ে গেছে, ভেতরটা ক্ষয়ে গেছে। যৌবনের সে লালিত্য, মাধুর্য, ঔজ্জ্বল্য আর নেই। চেহারার পরিবর্তন এসেছে। নিজেকে তার কালের এক অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টি মনে হল। কিন্তু মন? তাকে কাল কিংবা জরা স্পর্শ করতে নাও পারে। তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। মন তার পিছনে কিংবা পাশে নেই। একেবারে সামনে, প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সব

সীমাবদ্ধতার বাইরে সে। তাই নিমেষে চল্লিশ বছরের গণ্ডীটাকে মুছে ফেলে তার চব্বিশ বছরের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। পুরনো শুধু নতুন হয়ে উঠে। এই উপলব্ধি শরীর মনের ভেতর এক মুহূর্তের জন্য কোথা থেকে যেন কি ঘটিয়ে গেল।

কলকল করে বয়ে চলেছে যমুনা। খুশীতে উপচে ওঠছে তার ঊর্মিমালা। অজস্র খুশী, আর চপল হাসির আনন্দধারা ছড়িয়ে দিয়ে অভিসারিকার মত সে চলেছে। রতিরঙ্গের সুখ লেগেছে তার ঢেউয়ের দোলায়। পথের ভয় তার নেই। আছে শুধু পথ চলার বিস্ময়, আর অনাগতকে পাওয়ার আনন্দ।

যমুনার তীর ধরে রাধা সখীদের সঙ্গে চলেছে মথুরার খেয়াঘাটের দিকে। ফুরফুর মিষ্টি হাওয়ায় কেমন একটা শীত শীত ভাব। মেঘে ঢাকা সূর্যের মরা আলোয় চারদিকটা ম্রিয়মান। এসব ভ্রূক্ষেপ না করেই রাধা মুখ বুজে পথ হাঁটছিল। তাদের অঙ্গসৌরভ মিশে বাতাস হল গন্ধবহ।

যেতে যেতে ললিতা-বিশাখা জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনল। দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে তারা পিছন ফিরে তাকাল। দেখল দুটি অপরিচিত তরুণ নাক, ঠোঁট, ভুরু কুঁচকে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তাদের দুজনের খুব হাসি পেল। নাভিমূল থেকে একটা দুরন্ত বেপরোয়া হাসি যেন ঠেলে এল। যমুনার কল্লোলিত তরঙ্গের মত ভাঁজে ভাঁজে থাকে থাকে বিচিত্র স্বরে সে হাসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হিল্লোলিত হল। রাধার কিন্তু কোন হাসি পেল না। বরং কেমন একটা বিব্রত লজ্জায় আর আতঙ্কে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ললিতা বিশাখার হাসির তরঙ্গধ্বনি তার বুকের ভেতর দ্রুত লয়ে বাজতে লাগল। রক্তে তার বিপুল উৎকণ্ঠা। শিরায় শিরায় যন্ত্রণা।

মথুরার ঘাটে পৌঁছে দেখল মাত্র একখানি নৌকো খেয়াপারের জন্য বাঁধা আছে। তিন-চার জন পুরুষ আগে থেকেই নৌকোটি দখল করে আছে। তাদের জন্যই মেয়েরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারছিল না। ভয় পাচ্ছিল। ভয়টা

মাখামাখি হয়েছিল প্রত্যেক রমণীর চোখেমুখে।

ভয় শুধু অচেনা পুরুষকে নয়, ভয় দুরন্ত হাওয়াকে, মেঘলা আকাশকে। কারোকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কে যে কখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভয়ে মহিলারা অস্থির হয়ে পড়েছিল। হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল তাদেব বসন। শাড়ি সামলানো ভীষণ দায় হয়ে পড়ল। কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না। নৌকোয় পুরুষ আরোহীরা বাতাস আর শাড়ীর সঙ্গে মেয়েদের যুদ্ধ দেখে ভীষণ হাসছিল।

রাধা দেখল ললিতা-বিশাখা এবং আর আর মেয়েযাত্রীর চোখেমুখে যে ভয়টা মাখামাখি হয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বড় একটা আতঙ্কে তার বুক কাঁপছে। মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে গেছে, ত্বকের টানেই মালুম হচ্ছিল তার।

একটা মস্ত ঝাঁকড়া কদম গাছের ডালে একজোড়া কাঠবিড়ালী ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। তাদের দৌড়োদৌড়িতে, লড়ালড়িতে সরু ডাল মৃদু দুলছিল, পাতা কাঁপছিল, কেঁপেই চলছিল। সেইদিকে তাকিয়ে রাধা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তার। এই পৃথিবীতে মানুষের থাকার মত কি আর কোন জায়গা নেই? স্বার্থের লোভে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর মনের মধ্যে যত কুৎসিত ক্ষতের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকেই সে বিষিয়ে তুলছে।

আকাশে মেঘ থাকার জন্য রোদের তেজ তেমন ছিল না। কোকিল ডাকছিল গাছের ডালে। বুলবুলিটা চুপ করে একটা ডালে বসেছিল। মাঝি নৌকো থেকে পাত্রে করে জল সেঁচে বার করছিল। অপেক্ষমান মেয়ে যাত্রীরা ঘাটে দাঁড়িয়ে পুরুষ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গালি দিচ্ছিল। তাদের সঙ্গে খেয়া পার হওয়া নিয়ে উঁচু গলায় মহিলা যাত্রীদের মধ্যে দুটি দল হয়ে গেল। এক দল অন্য দলের সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দিল। কোথাও বা একজনের সঙ্গে অন্য জনের বচসা হচ্ছিল। নৌকোর

পুরুষযাত্রীরা তাদের কলহ উপভোগ করছিল। তাদের ভিতর একজনেরই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। রাধা লক্ষ্য করল, গলুইতে কুণ্ডুলি পাকিয়ে একটা লোক জড়সড় হয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছে। আপাদমস্তক তার শরীরটা একটা ময়লা কাপড়ে মোড়া। ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। লোকটাকে দেখে রাধার ভীষণ কষ্ট হল, সেই সঙ্গে কিছু মায়া ও করুণাও হল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বচসাও বাড়ল। অবশেষে পুরুষ আরোহীদের কেউ কেউ নামল। কেবল কুণ্ডলী পাকানো লোকটিই রয়ে গেল। মাঝিদের কেউ অসুস্থ ভেবেই মেয়েযাত্রীরা একে একে নৌকোয় উঠল। ইদানীং নদীতে এক নতুন উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। নৌকো পাবাপারিতে মেয়েদের নিরাপত্তা কমেছে। খেয়া নৌকো মাঝ গাঙে গেলে যাত্রীদের ভেতর থেকে হঠাৎ কয়েকজন হামলাকারী পুরুষ নিরীহ পুরুষ যাত্রীদের নদীতে ঠেলে দিয়ে নারীদেব বস্ত্র, অলংকার, অর্থ সব কেড়ে নেয়। তাদের শরীর নিয়ে টানাটানিও করে। সুন্দরী রমণী হলে তো আর রক্ষে নেই। বলপূর্বক নৌকোতেই তার ইজ্জত নষ্ট করতে সরমে বাঁধে না। তাই মেয়েরা দলবদ্ধভাবে সতর্ক এবং সাবধান হয়ে চলাফেরা করে।

ষোল বছরের আগের ঘটনা সমস্ত চেহারা নিয়ে রাধার সম্মুখে হাজির হল।

আকাশে মেঘ খুব ঘন হয়ে এল। দিনের আলো নিঃশেষে নিঙরে নিল কালো মেঘ। নৌকার অস্তিত্ব যমুনার রঙের সঙ্গে এক হয়ে মিশ। দিগন্তের গাছপালা, তীর সব কুয়াশামাখানো অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল। আকাশ থমথম করছিল। কিন্তু নদীতে অশান্ত অস্থিরতা। নৌকোর যাত্রীরা নীরব। সকলের চোখেমুখেই উৎকর্ণ ভয় আর আশঙ্কা। নোঙর তুলে মাঝি নৌকোটা স্রোতের মুখে যেই ঠেলে দিল, অমনি পুরুষযাত্রীরা লাফিয়ে নৌকোয় ওঠল। চেঁচামেচি, হৈ-হৈ পড়ে

গেল নৌকোব মধ্যে। তখন তারা কাকুতি মিনতি করে অভয় দিয়ে বলল: আমরাও মানুষ, চিন্তার কিছু নেই, ভয় পাওয়ারও কোন কারণ নেই। আমাদের ঘরেও বৌ আছে। তোমাদের সকলেরই স্বামী আছে। তবু, ভয় কেন এত?

উজান স্রোতে খেয়া নৌকো মৃদুমন্দ গতিতে ভেসে চলল। পুরুষগুলোর লুব্ধ দুটি চোখ চব্বিশ বছরের রাধার ভরা যৌবনের রূপ দেখছিল। তার নিটোল সুঠাম দেহকান্তি, উন্নত বক্ষের দিকে তাদেব দৃষ্টি আঠাকাঠির মত লেগে রইল। রাধার বুকের ধক্‌ধকানিটা শুরু হল এসময়। অন্যদিকে সে চোখ ফেরাল। তবু তার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে টের পাচ্ছিল তাদের লোভাতুর চাহনি।

ঘাটে যেসব মেয়েরা পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে একসাথে খেয়াপার হওয়া নিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কলহ করেছিল, তারা কিন্তু পুরুষ আরোহীদের সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলল। অল্প সময়ে তাদের ভেতর হাসিঠাট্টাও বেশ জমে গেল। কিন্তু তাদের গল্পগুজব, হাসি সব ছিল প্রাণহীন। প্রত্যেকের চোখেমুখে একটা ভয় এবং আতঙ্ক মাখামাখি ছিল। ঐ মেয়েগুলোর দেখাদেখি আর আর মেয়েরাও ভয় এড়ানোর জন্যই যেন ওদের মধ্যে ভিড়ে গেল। হাসি ঠাট্টায় তাদের মজিয়ে রেখে বিপদ এড়ানোর কৌশল নারীর চিরপুরাতন খেলা। এভাবেই বেশিরভাগ মেয়ে পুরুষকে বোকা বানিয়ে জেতার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বোঝে না নিজেদের সস্তা করার রন্ধ্র পথ ধরেই বিপদ আসে অতর্কিতে।

রাধার বুকে ভয় জমে বরফ হয়। বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল বাতাসে। শান্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতিলোকে নদীতে, পাহাড়ে, দিগন্তলীন অরণ্যে, বিপদের হাতছানি প্রত্যক্ষ করে সে যেন বার বার শিউরে উঠে। ভয় থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে এক অদৃশ্য বন্ধনে তার সহযাত্রীরা জড়িয়ে পড়ছে। কেবল রাধাই নির্বিকার। প্রকৃতি তাকে এক অদৃশ্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন

করছে যেন। মনের আববণ খুলে কৃষ্ণ তাকে চিনতে শিখিয়েছিল গাছ, পাখী, বন, লতাপাতা, ফুল, জঙ্গল, আকাশ, নক্ষত্র এবং এই পৃথিবীকে যারা সুন্দর করে, মধুর করে, কুৎসিত করে তাদেরও। মেঘে ঢাকা এই কালো আকাশ, নিভু নিভু দিনের আলো যে ভয় দিয়ে একটু একটু করে ঢেকে দিচ্ছিল পৃথিবীকে তা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। রাস্তাও নেই কোন। উৎকণ্ঠা, ভয়, ভাবনায়, অস্থিরতায়, যন্ত্রণায় এবং দারুণ অসহায়তায় নদীর তরঙ্গ যেন বিচলিত। ঢলানি মেয়ের মতো ঢেউর গায়ে পড়ে নৌকা যেন বিপদ রুখছে। কিন্তু এতো মুক্তি নয়, বিপদের সবচেয়ে বড় বন্ধন। এসব ক্ষেত্রে সাহস আর দৃঢ়তার বিকল্প নেই। কিন্তু মেয়েগুলো সহজ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অসংযত আর অশান্ত হয়ে উঠার ফলেই বিপদটা প্রধান হয়ে উঠল। ওরা যদি তাদের উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে দেখত, অবহেলা, উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পারত তাহলে পুরুষ আরোহীরা সংযত থাকত। তাদের বুকে ভয় থাকত। কিন্তু মেয়েগুলো শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভয়ের বাঁধনে এমন করে নিজেদের জড়াল যে দড়ির বন্ধনে তাদের সমস্ত সত্তা যেন ফুলে ফুলে লাল হয়ে ওঠল তাদের মুখের ত্বকেও লাল আভা ফুটল। নিজ নিজ মনের কারাগারে যে তারা রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল একথাটা তারা না বুঝলেও রাধা বুঝেছিল। কৃষ্ণের কথা মনে পড়ল: বিপদের সময় নিজেকে খুব চালাক ভেবে সহজে কিস্তি মাত করে যারা জয় আদায় করতে চায় তারা রসাতলে যায়, জীবনের অন্ধকার গুহায় নির্বাসিত হয়। এদের আকাশ ছোট। অনুভূতির বৃত্ত সংকীর্ণ। এরা নিরুপায়। একেবারেই নিরুপায়। মানুষের জীবনে এরাই সবচেয়ে বড় কারাগার তৈরী করে। লোভের কারাগারে, স্বার্থের কারাগারে এরা থাকে বন্দী। আর, যাদের আবেগ, স্বাভাবিকতা চালিত করে তারাই কেবল উছলে উছলে দৌড়ে যেতে পারে এই জীবনের পথ বেয়ে। তারা ঝর্ণার মত মুক্ত,

সমুদ্রের মত দুরন্ত, আকাশের মত বিশাল। তারাই মুক্তি, তারাই সুখ, তারাই সত্য। রাধা, তুমি আমার—সেই নিঃসীম নীল অম্বরের মত।

সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর রাধা কানের খুব কাছে শুনল। সুন্দরী তুমি নীরব কেন? এমন বিষণ্ণ কেন দেখাচ্ছে তোমায়?

রাধার শরীরটা শিউরে ওঠেছিল। তন্ময়তা কেটে গেল। চমকে তাকাল। ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। কেমন অসহায় কাতর দৃষ্টিতে মিশকালো লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মুখ নীচু করল। দুই হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে খুব সতর্ক এবং উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকল। তার কম্পমান শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। বুক থেকে ঝড়ের মত পর পর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

মিশকালো লোকটা রাধার পিঠ স্পর্শ করে ফিস্ ফিস করে বলল: সুন্দরী তোমার কোন তুলনা নেই। মথুরা খুঁজলে তোমার মত রমণী একটিও মিলবে না। আগুনের মতন তোমার রঙ, চোখা চোখ, খাসা মুখ, টিকল নাক, জোড়া ভুরু। বিল্বফলের মত যুগল বক্ষের ঐ অপরূপ শোভার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়োয়। মনটা প্রাপ্তিতে টৈ-টম্বুর হয়ে যায়।

রাধার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা আগুনের হল্কা বয়ে গেল। ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত দেহটা টান টান হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছে করল প্রচন্ড একটা থাপ্পড় মেরে লোকটাকে কিছু শিক্ষা দেয়; কিন্তু মাঝ গাঙে নৌকোয় দাঁড়িয়ে সেই দুঃসাহস দেখাতে পারল না। জ্বালা ধরানো ভীষণ ক্রোধটা বুকের ভেতর পুষে রেখে সে একটু সরে দাঁড়াল। লোকটিকে কোন আমল দিল না। তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

লোকটা কিন্তু তাতে দমল না। রাধার গায়ে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বলল: মাইরী কি নরম! ননীর মত। আহা, ননী দিয়ে তৈরী শরীর। কোমলতা যেন চুঁইয়ে পড়ছে গায়।

অপমানে লজ্জায় রাধার দুচোখে আগুন জ্বলল। সে আগুনে

একটা তীব্র রাগ, ঘৃণা, প্রচণ্ড অসহায়তা এবং অভিমান ছিল। একটু ভেঙে পড়ার ব্যাপার ছিল না। কোষমুক্ত কৃপাণের মত দৃঢ়তায় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। দুপাশের চোয়ালের হাড় তার শক্ত হল। শরীরের কোষে কোষে তার টাটানি। রাধার রূপান্তর দেখে লোকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। প্রতিরোধের দৃঢ়তায় তাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় লাগছিল।

নৌকোর অন্য প্রান্তে মেয়েদের কোলাহল, কান্নাকাটি সুরু হয়ে গেছে। খুব অসহায়ভাবে কাকুতি-মিনতি করছে তারা। অনেকক্ষণ ধরে যে আনন্দে মশগুল ছিল তারা নিমেষে তা ছাই হয়ে গেল। লোকগুলো দস্যুর মত ভয়ংকর বর্বর আর হিংস্র হয়ে ওঠল। মাঝিরা চুপ করে ছিল ভয়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে হাল ধরে নৌকো সামলাচ্ছিল তারা।

লোকটি দুঃসাহস দেখানোর আগেই রাধা দুর্জয় সাহসে তাকে প্রচন্ড এক চপেটাঘাত করল। লোকটা বেসামাল হয়ে নদীতে পড়ে গেল। এরকম একটা অদ্ভুত মারের মুখে পুরুষযাত্রীরা হক্‌চকিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য হয়ে তারা যখন রাধার স্পর্ধাকে দেখছিল ঠিক সেই সময় ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। গলুইতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ গায়ের চাদরটা লোকগুলোর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তেড়ে গেল তাদের দিকে। নৌকোটা বীরপদভারে ভীষণভাবে দুলে উঠল। উচ্ছ্বল তরঙ্গের দোলায় নৌকো এমনি টলমল করছিল, হঠাৎ সেই দোলায় বেসামাল হয়ে পড়ল মেয়েযাত্রীরা। ভাল করে কারো কিছু বোঝার আগে বেমালুম মার সুরু হয়ে গেল তাদের ওপর। দস্যুরা প্রতি-আক্রমণ রচনা করার আগেই ধরাশায়ী হল। কারো কারো মুখ দিয়ে ঝল্‌কে ঝল্‌কে রক্ত পড়তে লাগল। কেউ বা সংজ্ঞা হারাল। গোটা দৃশ্যটা স্বপ্নের মত ঘটে গেল নৌকোয়। চোখ দুটিতে তখনও আতঙ্ক, ভয় মাখামাখি। এক অদ্ভুত মুগ্ধতা, কৃতজ্ঞতা, বিস্ময়

নিয়ে যখন মহিলারা চিনতে পারল কৃষ্ণই তাদের রক্ষাকর্তা তখন নিমেষেই স্বস্তি জ্বল্‌জ্বল্‌ কবে উঠল তাদের চোখের মনিতে। বৃন্দে কৃতজ্ঞতামাখা অস্ফুটস্বরে বলল: ভাগ্যিস তুমি ছিলে কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ হাসিমুখ করে বলল: কেমন করে বুঝলে? বৃন্দাবনের বয়স্করা বলে কেলে ছোঁড়া।

কৃষ্ণের কথা শুনে কারো হাসি পেল না। এক গভীর তীব্র দুঃস্বপ্নের সঙ্গে মিশে গেল তাদের প্রত্যেকের অন্তরের এক গভীর ভালবাসা। তাই, কারো মুখে কোন সামান্য কথাও এল না। দুপুরবেলার স্থলপদ্মের মত তাকিয়ে আছে তারা। এমনকি রাধাও। রাধার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। মানুষের অনেক অনুভূতি তার শরীরে ঘুমিয়ে থাকে, চোখের চাউনিতে তার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে, কারো কারো গলার স্বরে গলে পড়ে। বিশাখার গলায় শান্ত স্নিগ্ধ ভালবাসার করুণাধারা। কথা বলার সময় বুকের ভেতরটা তার আলোর আভায় ভরে গেছে। আস্তে আস্তে বলল: কালো? তোমায় কালো ছোঁড়া বলে গাঁয়ের লোক!

বৃন্দে মুগ্ধ দুটি আঁখি পেতে রাখল কৃষ্ণের চোখের ওপর। অভিভূত গলায় বলল:

তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

—কিন্তু তুমি কোথা থেকে এলে? এমন যে ঘটতে পারে তুমি কি জানতে? কেমন করে তুমি টের পাও কৃষ্ণ? বাতাস কি তোমাব সঙ্গে কথা বলে?

কৃষ্ণ শুধু হাসে। তার হাসিতে মুক্তো ঝরে। নম্র সে হাসি সব কিছুকে মেনে নেওয়ার এক নীরব প্রশান্তিতে স্নিগ্ধ আর মধুর।

ললিতা অবাক বিস্ময়ে কৃষ্ণের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল অনেকক্ষণ। রঙ্গ করে বলল: রসের নাগর। তোমার ঐ কালারূপে কি যাদু আছে, জানি না, বাপু? যে দেখে সেই মজে।

রাধা শুধু কুল মজাল না, গোটা বৃন্দাবনের রমণীকুলকেও মজিয়ে ছাড়লে।

কুটিলা ভর্ৎসনা করে বলল: ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা। সত্যিই অধঃপতন হয়েছে তোর কানাই। বৃন্দাবনে কাউকে মানিস না। তোর কাজের কৈফিয়ৎ চাওয়ার মানুষ নেই। নিজের খুশি মতন যা খুশি করিস। মেয়েমানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই তোর কাজ। বেঁচে থাকতে হলে একটু লুকিয়ে চুকিয়ে করতে হয় সব কিছু। সমাজ-সংসারকে তুই মানিস বা না মানিস কিন্তু সে তো আছে এবং থাকবেও।

সপ্রতিভ কৃষ্ণ উত্তরে বলল: ঠিক বলেছ মাসী। কিন্তু পচা গলা, মরা একটা প্রথাবদ্ধ জীবনের জীর্ণ কারাগারে নিজেকে বন্দী রেখে পরকালের কোন সাধনধামে পৌঁছবে? অসহায়ভাবে মানুষের এইভাবে ডুবে মরাটাও চোখে দেখতে পারি না। সারা দেশে আজ ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। মানুষকে প্রেমে, ভালবাসায়, সৌভ্রাত্রে, বন্ধুত্বে, মাতিয়ে তুলতে হবে। মুক্তি, সর্বস্তরে সেই মুক্তি আনবে মথুরার ছেলে মেয়েরা হাতে হাত মিলিয়ে। তুমিও।

ভুরু কুঁচকে কুটিলা জিগ্যেস করল: তার মানে? কি বলছ তুমি?

নৌকোশুদ্ধ রমণীরা কৃষ্ণের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। কৃষ্ণের মুখে অনির্বচনীয় হাসির ছটা। বলল: মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলে, পুরুষের চেয়ে কোন্ দিক দিয়ে তোমরা কম? মেয়েমানুষের রক্তের রঙ, পুরুষের রক্তের রং কি এক নয়? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনুভূতি, উপলব্ধি, ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, হাহাকার, যন্ত্রণা, কষ্ট মেয়ে বলে কি তার আলাদা? তোমরা মেয়েরা ইচ্ছে করেই পরাধীনতা ভালবাস। তোমরা চাও একজন কেউ তোমাদের ওপর জুলুম করুক, জোর করুক, দাবি খাটাক, তোমাদের চালাক, পরাধীন করে রাখুক। অধীনতার এই গ্লানিতে তোমাদের মনপ্রাণ আচ্ছন্ন। এ থেকে মনটাকে মুক্ত

করে গণ্ডীর বাইরে যেতে চাওনা। বৃহৎ জীবনকে দেখতে চাওনা, চিনতে চাওনা! ইচ্ছে করেই নিজের ছোট্ট খুপরির মধ্যে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চাও। কিন্তু কেউ যদি গণ্ডীর বাইরে বেরোতে যায় অমনি অক্টোপাশের মত চারদিক থেকে তোমরা সমাজ, সংসার, সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্ম নিয়ে হৈ-হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়। গেল, গেল বলে চিৎকার জুড়ে দাও। কিন্তু কি হারাল, কি থাকল, কি পেল, আর তার জন্য সংসার, সমাজ ধর্ম কতখানি বদলে গেল, তার হিসাব করলে না কখনও। আক্রমণের ব্যাপারে তোমরা মহিলারা বড় বেশী সচেতন আর নিষ্ঠুর। পুরুষের মত হাতাহাতি কর না, কিন্তু মনের অভ্যন্তরে যে চাবুক হান তার জ্বালার দাহ নিদারুণ। সংঘর্ষে জিততে তোমরা কলঙ্ককে, কুৎসাকে, মিথ্যাকে দুর্নামকে অস্ত্র করে তোল। বিবেকহীন, বিচারহীন, মনুষ্যত্বহীন অশালীন আচার আচারণ হল তোমাদের জেতার কৌশল। গৃহযুদ্ধে তোমরা সকলেই বীরাঙ্গনা। কিন্তু রণনীতির কারণে শক্তির অপচয় আর বুদ্ধির বাজে খরচ হয়। এটুকুই যা তফাৎ পুরুষের সঙ্গে। যুদ্ধের সামনা-সামনি হলে তোমাদের রক্ত যেমন চন্ চন্ করে ওঠে, তেমনি পুরুষেরও করে। তা-হলে পুরুষ এবং নারীর ধর্ম, স্বভাব, প্রকৃতির পার্থক্য কোথায়? পুরুষ ও নারী মিলে এই পৃথিবীর স্রষ্টা। বিধাতার সৃষ্টিশালায় নারী সৃষ্টিছাড়া হয়ে থাকবে কেন? সৃষ্টির শরীককে শরিকানা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার বিধাতাও মানুষকে দেয়নি। নারী দৈহিক বলে পুরুষের চেয়ে হীনবল হলেও অনেক ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার ধৈর্য স্থৈর্যের কোন তুলনা নেই। পুরুষ বেপরোয়া অসংযমী, স্বেচ্ছাচারী। সে সমুদ্রের ঝড়ের মত। সে ভাঙতে পারে, ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু নারী স্নেহ, মমতা, সেবা করুণা, মায়া দিয়ে মহাশ্মশানের বুকে স্বর্গ রচনা করে। ক্রোধ পুরুষের রিপু, স্থৈর্য নারীর শক্তি। এটাই হল নারীর যুদ্ধে জেতার অন্যতম চাবি। পুরুষ শক্তির সঙ্গে নারীর শক্তির সমন্বয় হওয়া বড় দরকার।

আমার চোখে পুরুষ ও নারীর কোন দ্বৈতসত্তা নেই। তারা দুজনে মিলে একজন। তাই তো মথুরার মুক্তিযজ্ঞে যুগ্ম ঋত্বিক পুরুষ ও নারী।

কুটিলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। এসব কথা কতখানি সে বুঝল বোঝা গেল না, কিন্তু চোখেমুখে একটা প্রবল মুগ্ধতার ভাব সঞ্চারিত হল। শুধু কুটিলার নয়, নৌকোর মহিলা যাত্রীর মনকে বিশ্বাসকে এমন করে কৃষ্ণ নিঙরে নিল যে আকাশের বিদ্যুৎ চমকানোর মতই তারা বুঝল এ মিথ্যে ভাণ নয় কৃষ্ণের। এ সত্যিই তার ভালবাসা থেকে উৎসারিত জীবন সত্য। তার মধ্যে যদি ভণ্ডামি, মিথ্যে ছলনা থাকত তাহলে এমন করে মর্মের গভীরে কখনো দাগ কেটে বসত না।

গাঢ় গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে ভেসে এল রাধার কণ্ঠস্বর। কী ভাল যে লাগছে আমার! বলেই কৃষ্ণের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পায়ের তলায় নৌকো টলে যেতে রাধা কৃষ্ণকে ধরে টাল সামলাল। তাতেই ওর চুলের গন্ধে, দেহের ঘ্রাণে কি যেন হয়ে গেল রাধার। মাথার মধ্যে হঠাৎ সব কি যেন ঘটে গেল। চাপ চাপ সবুজ কোমল কচি ঘাসে মুখ ডুবিয়ে চিতল হরিণী যেমন গন্ধ নেয়, তেমনি কৃষ্ণের কালো পিঠে কয়েকটা মুহূর্ত মুখ ডুবিয়ে রাধা যেন তার দেহের, যৌবনের সব সৌরভটুকু নিঃশেষে টেনে নিচ্ছিল। কৃষ্ণের শরীরটার মধ্যে যে এতসব অসামান্য আনন্দের উৎস লুকোনো ছিল তা তার আকস্মিক নিবিড় সান্নিধ্যটুকু না পেলে বোধহয় জানা হত না। মানব-মানবীর এই আশ্চর্য শরীরে দহন আর প্রলেপ বোধহয় এমন নিঃশর্তভাবেই নিহিত আছে। বিয়ের পর আয়ানের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছে, শরীরে শরীরে ছুঁয়ে গেছে আচমকা কিন্তু এ ধরনের কোন হর্ষকর অনুভূতি বোধহয় জাগেনি। শরীরের গভীরে অস্ফুট এক গভীর সুখের শব্দ ওঠছে।

কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম। তারপরেই ফিস্ ফিস্ গলায় বলল: তোমার আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য না হয়, আমি দুঃখই বইব।

জীবনকে সুন্দর করার যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরে থরে থরে সাজানো তার জন্য আমি সব করতে পারি। আমি তোমার অনন্ত বাসনায় অমৃত প্রেমশিখা হয়ে থাকব তোমার সকল আকাঙ্ক্ষায়। এতকাল যা পারিনি দিতে, আমি তাই দিলাম তোমায়। আমার সর্বস্ব তুমি নাও-হে পরাণ বঁধু।

নদীতে তখন ঝড় ওঠেছে। শনশন করে বায়ু বইছে। স্রোতের ধাক্কায় নৌকো দুলছে। প্রমত্ত ঝড়ের ভেতর কুটিলার ধিক্কার যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ছিঃ বৌমণি মেয়ে মানুষের লাজ-লজ্জাটুকু তোর ভেতর আর নেই। এক নৌকো লোকের মধ্যে বেহায়া হতে তোর শরমে লাগল না? তুই মানুষ? ছিঃ।

কুটিলার কথা কৃষ্ণের কানে গেল না। বিস্ময়ে আনন্দে চমৎকারিত্বে তার দুই চোখ ঝক্ঝক্ করে উঠল। বুকের ভেতরটায় অশান্ত ঝড়ের উতলাভাব। বিস্ময়ে চমকে বলল: রাধা!

খুশীতে কৃষ্ণের ভেতরটা কি যেন দাপিয়ে বেড়াল অনেকক্ষণ। ঝকঝকে দুই চোখে তার আনন্দের দ্যুতি। আবেগে মাতাল তার অন্তঃকরণ। উত্তেজিত চাপা আনন্দে তার কণ্ঠে স্নিগ্ধ সিক্ততা সঞ্চার হল। বলল: রাধা। মনের কথা বুঝিয়ে বলি এমন মনের অবস্থা আমার নয়। মনে হচ্ছে, এই আকাশ, বাতাস, নদী, বন-উপবন, পৃথিবী সব আমার। আমিই এর অধীশ্বর। আমি ইচ্ছে করলেই এই বিশাল পৃথিবীর সবকিছু জয় কবতে পারি। আমার ভেতর কোথা থেকে কুল-ভাসানো এই জোয়ার এল? রাধা তুমি আমার বুকের ভেতর প্রমত্ত ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? হালের শাসন যেমন নৌকো মানতে

চাইছে না, তেমনি আমার বুক টাটাচ্ছে। সব বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা তরল আগুনের স্রোতের মত শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। ভাললাগার মত্ততা শরীরের প্রতি কোষে যে এত উল্লাস ও যাতনা দিতে পারে তা তো জানা ছিল না। রাধা তোমাকে না পেলে নিজের ভেতর লুকনো অন্য এক বিশ্বকে কোনকালে টের পেতাম না।

রাধা কথা বলে না। মৃদু মৃদু হাসে। তার দুই চোখ আবেশে আচ্ছন্ন। চোখের ভাষায় কথা বলে ভালবাসি, ভালবাসি। মুগ্ধ অথচ বিচলিত কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরও স্খলিত, শিথিল অসাড়তায় ডুবে গিয়েছিল। বলল: রাধা, তুমি কে জানি না? চিরদিন মনে মনে আমি যেমনটা চেয়ে এসেছি কে যেন ঠিক তেমনটাই আমার জন্যে করে রাখে। তুমি আমার একটা বিরাট কাজকে এক কূল থেকে অন্যকূলে নিয়ে যাওয়ার ভেলা। তুমিই অজান্তে আমার মোহন বাঁশীতে সুর ভরে দাও।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এলো ধেয়ে। বৃষ্টি কখনো মুষলধারে কখনো কিঞ্চিৎ মৃদু, নিবিড় ধারালো। ঝড়ো বাতাস। সঙ্গী বৃষ্টিকে যেন নাচায় কাঁপায়, হাতে হাত ধরে মাতামাতি করে, তরঙ্গও তার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর গায়। রাধার মনে হল, যেন দীর্ঘ তপ্ত গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি নামল। ভাললাগে কৃষ্ণের এই উজ্জ্বল যৌবন রূপের মাধুরী দেখতে। ভালো লাগল ভরন্ত কলসের মত ভরে উঠতে। তবু মুগ্ধ অভিভূত রাধার মুখ দিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ হল না। অনির্বচনীয় মহিমময় এক সুখের মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছিল। মগ্ন সুখের অভিব্যক্তিহীন এক অচৈতন্য ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে সে মনে মনে বলছিল: আঃ কি ভাল লাগছে। কী ভীষণ ভাল লাগছে তোমাকে কৃষ্ণ। ইচ্ছে হল, সামনেই বলে, কৃষ্ণ তোমার আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে দাও। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু আদর কর। চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দাও অধর যুগল।

কিন্তু এসব কিছুই বলতে পারল না রাধা। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ

করে কৃষ্ণের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইল। চোখের কোণে আকর্ণ কাজলের মত রেখাটি তার কেমন স্বপ্নালু হয়ে ওঠেছিল। তার সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে ছিল আত্মদানের থর থর আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু সেই মধুর আবেশটুকু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুটিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে। চোখমুখ তার তীব্র ধিক্কারে ঝলকে ওঠল এবং তার ভাষা বদলিয়ে গেল।

কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে সে তার নির্লজ্জ আবেশকে তিরস্কার করে বলল: ছিঃ ছিঃ লজ্জাসরমের মাথা একেবারে খেয়েছিস। এদের পাপ, পৃথিবীও বইতে পারছে না। তাই প্রকৃতি জুড়ে ঝড়ের তান্ডব। দুর্যোগের ঘনঘটা। বিধাতা তোদের ব্যাভিচার ক্ষমা করতে পারছে না বলে নদীতে এত ঢেউ। জীবন বাঁচানো দায়।

রাধা ও কৃষ্ণের মুগ্ধ মুহূর্তের ঘোর কেটে গেল কুটিলার তীক্ষ্ণ বিদ্ধ সন্দেহে। বাস্তবসচেতন হল কৃষ্ণ। রাধা রীতিমত অপ্রস্তুত হয়। কেমন যেন অপরাধীর মত দেখল তাকে। তার সেই ভাব কাটিয়ে তোলার জন্যে কৃষ্ণের দিকে তাকাল। কৃষ্ণের গম্ভীর মুখে হঠাৎ হাসি ফুটল। অপমানের করুণ হাসি সে নয়। পাপজনিত ক্ষমা প্রার্থনাও ছিল না সে হাসিতে। কৃষ্ণের মুখে যে অনির্বচনীয় সুন্দর হাসি লেগে থাকে এই সেই সুধা ঝরানো হাসি। এ হাসি দূরে সরিয়ে দেয় না, খুব কাছেও টেনে নেয় না, অথচ একটা গভীর আকর্ষণ অনুভূত হয়। এ হাসি অদ্ভুত সুন্দর। একটু প্রগলভতা ছুঁয়ে থাকে। বলল: কুটিলা মাসি, তোমার কথা শুনে আমি হেসে মরে যাই। তোমার পাগলামির কি জবাব দেব বলত? তুমি মুখে বলছ পাপ করছি আমরা, কিন্তু পাপবোধের জন্যে তো কোন অনুশোচনা, দুঃখ নেই মনে। এতগুলো লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে লজ্জাসরম জলাঞ্জলি দেয়ার মত কোন কাজ করেছি, বল? রাধা তার দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা নিবেদন করেছে। আমার

আদর্শকে, পথকে ভালবেসে যদি নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে সে, তাতে অপরাধ কোথায়? আমি যদি তাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, হৃদয় নিবেদন করি —তাতে ভালবাসা পাপ কেন হবে? ভালবাসা দিয়েছে কে আমাদের? ভালবাসাই প্রকৃতি, ভালবাসাই ধর্ম, ভালবাসার আর এক নাম ঈশ্বর। এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই, অন্যায়ও নেই। জীবনের ধর্ম। জীবের ধর্ম। তাহলে তুমি কেন একে পাপ চোখে দেখছ? এমন শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ভালবাসতে কজন জানে? তোমাদের মত রাধাও মেয়ে। তথাপি তোমাদের দুজনের জগৎ কত আলাদা? তার ভালবাসা, বিশ্বাস, স্বাধীনতা অনেকটা বন, নদী, পাহাড়, মাটি, আকাশ তারাকে যেমন করে মানুষ ভালবেসেছে শিশুকাল থেকে অনেকটা সেরকমই। কিন্তু পরাধীনতায়, হীনতায়, নীচতায় তোমার মনপ্রাণ এত সংকীর্ণ ও আচ্ছন্ন যে স্বশক্তির স্বরূপকে তুমি জান না। স্বাধীনতাবোধ না জাগলে চিত্তের বোধন হয় না। স্বাধীনতা মানে নিজেকে বেশি করে বিশ্বাস করতে শেখা, নিজেকে মর্যাদা দেওয়া, নিজের শক্তির উপর ভরসা করার অনুভূতি, উপলব্ধির শিক্ষায় নিজেকে নতুন করে গড়া। তোমার মধ্যে সে বোধ নেই বলে তোমার ক্ষয় হচ্ছে প্রতিদিন, কিন্তু কোন ক্ষতিপূরণ হচ্ছে না।

কুটিলা কোন জবাব দিল না। কেবল একটা গভীর গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ক্ষিপ্ত নদীর দিকে চেয়ে বসে রইল।

মহিষকালো আকাশে বাজ-ডাকা বিজলীর হানাহানি। মাটি উপড়ানো বাতাসের নিরন্তর শাসানো, দাপানো, ঝাপটানো ক্রমেই প্রবল হতে লাগল। এমন শন্ শন্ দুরন্ত বাতাসের গতিতে নৌকো তীরে নিয়ে আসাই দায় হয়ে উঠল। প্রাণভয়ে তখন সকলে বিচলিত। ঝোড়ো বাতাস বৃষ্টিকে সঙ্গী করে খোলা নৌকোর বুকে এমনি মাতামাতি, নাচানাচি সুরু করল যে নৌকো প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝড় এসে নৌকোর মাথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল, কখনও স্রোতের

ঝাপ্‌টা এসে ছুঁড়ে দিল নৌকোকে। অমনি বাতাস এসে নৌকোর একপাশ কাত করে দিল। বেশ খানিকটা জল মুহূর্তে চল্‌কিয়ে ঢুকে গেল নৌকোর অভ্যন্তরে। টাল সামলাতে না পেরে রাধা মুখ থুবড়ে পড়ল নদীতে। মহাত্রাসে চীৎকারে করে ওঠল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল আকাশে। ভয়ংকর আর্তস্বরে মহিষকালো মেঘ ডেকে ওঠল। দুরন্ত বাতাসও যেন সহসা হায় হায় করে ওঠল।

নিমেষের মধ্যে নদীতে ঝাঁপ দিল কৃষ্ণ। প্রাণভয়ে রাধা সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে কৃষ্ণকে দুহাতে আঁকড়ে ধরল। বাতাসের গোঙানির মধ্যে বিপন্ন রাধার অসহায় কান্না চাপা পড়ে গেল। বৃষ্টিতে তার চোখের জল ধুয়ে গেল। নদীর ক্ষিপ্র স্রোতের টানে বসন খুলে গেল। লজ্জা ভেসে গেল। নিস্তেজ শরীর প্রাণহীনের মত পরম নিশ্চিন্তে, আর আরামে কৃষ্ণের বুকের ওপর পড়ে রইল। কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরার বাহুর বাধনও তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তার মাথার চুলে ঢেকে গিয়েছিল কৃষ্ণের মুখ, ওষ্ঠ, চোখ। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর রাধা কৃষ্ণের বুকের ওপর ভাসতে লাগল জলে।



রাধা যখন পঁচিশ বছর বয়সের কথা ভাবছিল, তখন ঐ বিশেষ বছরের কখন কোন ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, কোন্‌টা আগে অথবা পরে তার সঠিক সময় তার অনুভূতির ভেতর নেই। অনুভূতিতে সন, তারিখ, বার, সকাল, সন্ধ্যা কিছুই থাকে না। বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে সে তো তার কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়।

এক অদ্ভুত সুখের আনন্দে তার মন আচ্ছন্ন হয়েছিল। সারাটা পথ এক যেতে যেতে তার মনে হলঃ

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি মোর থির নাহি বান্ধে।

আনন্দের হৃৎস্পন্দনে সে কাঁপছিল ক্ষণে ক্ষণে। বিপুল

খুশীর এই রেশটুকু. তার কিছুতে শেষ হতে চাইছিল না। আবার এই সুখটুকুকেও কিছু দিয়ে মাপতেও পারছিল না। সময় দিয়েও নয়। আবার, এর বেদনা যেন ফুরোয না। স্বপ্নে স্মৃতির মতন মনকে ভরিয়ে রাখে বাসনায। রাধা একা পথে যেতে যেতে তরুলতা, বনকে তার ভাললাগার কথা শোনাল। বললঃ ওগো তরুলতা-বন, ওগো আকাশ, নদী , বাতাস শোন, এ আমার কি হল? আমার সমস্ত শরীরে লেগে আছে কৃষ্ণেব নবনীর মত শরীরের স্নিগ্ধ সিক্ততা। ভাললাগার এক অনাবিল আনন্দ ভরন্ত কলসের মত আমার তনু মন প্রাণকে কানায় কানায় ভরে দিচ্ছে। আমার শরীরের ভেতব পুজোব ঘণ্টা বাজছে। আঃ কি যে ভাল লাগছে। আমার হৃদয় জুড়ে বাজছে তার বেনুধ্বনি। আমার অঙ্গে অঙ্গে এ কোন্ সমুদ্রের ঢেউ? নিঃশ্বাসে কার শরীরের গন্ধ লেগে আছে? এ আমার হল কি? মনে হচ্ছেঃ

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

—এই চির অতৃপ্ত কথাটা ভেবে তার চোখে জল ভরে গেল। বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু হাওয়া ছিল না। প্রকৃতিব এই ছটফটানিহীন, শান্ত, ধীর স্থির ভাবটি ভাল লাগল রাধার। নিজের মনের আবরণ খুলে দেখল নিজেকে। আয়ান তাকে চিনতে শিখিয়েছিল। সে মর্তের কেউ নয। স্বর্গভ্রষ্টা কোন দেবী। আর কৃষ্ণ বৈকুন্ঠের নারায়ণ। বৈকুণ্ঠপতি বিরহ সইতে পারে না, তাই মর্তভূমিতে তিনিও এসেছেন কৃষ্ণরূপে। কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়ে সে এই প্রথম অনভুব করল :

মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।

কন্ঠস্বর সহসা থেমে গেল তার। ঠান্ডা হওযায় তার ভিজে শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। ঘরের কাছাকাছি হতে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। চমকাল! কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। শরীরের

ভেতর যে এত লজ্জা লুকনো থাকে জানা ছিল না তাব। নিজের দিকে তাকাতেই লজ্জা কবছিল। শায়া কাচুলি ছাড়া কিছু ছিল না অঙ্গে। এভাবে ঘবে ফেরাই দায় হল। কী যে করবে ভেবে পেল না। নারীর সব লজ্জা শাড়ীর একটা আশ্চর্য প্রলেপে যে এমন করে ঢাকা থাকে, আগে অনুভব করার সুযোগ হয়নি তার। খুব ভয়ে ভয়ে আঙিনায় পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী জটিলা তার পথ আগলে দাঁড়াল। রাধাকে দেখে সে চমকে ওঠল লজ্জায়। ঘেন্নায় ভিতরটা ছিঃ ছিঃ করে উঠল। দরজার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বললঃ বৌমা! জটিলার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ দুটো বিস্ময়ে, ক্রোধে ছোট হয়ে গেল। গলায় উত্তাপ ঢেলে বলল : ছিঃ ঠিক করে বল, কি হয়েছে?

রাধা শরমে বিব্রত। কাপা গলায বলল · জানি না মা।

জান না? ন্যাকা –

বিশ্বাস করুন, গল্প মনে হবে। প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকো গেল উল্টে। আমি নদীতে পড়ে গেলাম। মৃত্যুভয়ে ভয়ার্ত স্বরে ডাকলাম, হে ঈশ্বব, তুমি যদি সত্যি থাক সতী রাধাকে বাঁচাও। বাঁচাও। ঈশ্বর কোথায় ছিলেন জানি না। ভয়ার্ত সতী নারীর ডাক শুনে বিচলিত নারাযণ বোধ হয় একটা তমালের গুঁড়ি ভাসিয়ে দিলেন জলে। ডুবে যেতে যেতে দেখলাম, একটা কাঠের কি ভেসে আসছে আমাব দিকে। মরিযা হযে প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে ধরলাম। তাবপর, মূর্ছা গেলাম। জ্ঞান হলে দেখি নদীব ধারে পড়ে আছি। কিন্তু সে তমালের কাষ্ঠখণ্ডটি নেই।

করুণা মমতায জটিলার প্রাণটা টলমল করে উঠল। গলাব স্বরে তার বিস্ময়। সে কি? বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস আজ। কিন্তু তোব ননদিনী কুটিলা কোথায়?

কিছুই জানি না।

জটিলার বড় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ভেজা গলায় বললঃ

এখন মেয়েটাব কপালে যে কি আছে ঈশ্বব জানেন। যতক্ষণ না তাকে চোখে দেখছি ততক্ষণ মন শান্ত হবে না— জটিলা ভয়ে চোখ বুজল। বুকেব ভেতব থেকে গুবগুব করে একটা কান্না তাব গলাব কাছে এসে দলা পাকিয়ে বইল।



রাধা কেমন হয়ে গেল। তাব এই চল্লিশ বছব জীবনে সবশুদ্ধ সে মাত্র পাঁচ কি ছয় বছরের মত সত্যিকাবে বেঁচেছিল। বাদবাকি দিনগুলি ছিল শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। কৃষ্ণের সঙ্গে দিনগুলিই ছিল তাব জীবনেব এক অনাবিষ্কৃত স্মবণীয অধ্যায। পৃথিবার মত সে ঘুরছে না। সূর্যের মত মনের ভেতর সে স্থিব হয়ে আছে। কৃষ্ণ মথুবা ছেড়ে চলে যাওযাব পব আব তাকে নিয়ে সে ভাবেনি। একটা বড় আঘাত অনেক গর্বের ঘটনাকে অনুযোগহীনভাবে চিবতবে মস্তিষ্ক থেকে বিদায়

দিয়েছে। কিছু কিছু সময় মুহূর্ত আসে সকলের জীবনে যখন হারানো প্রিয়জনের কথা ভাবতে একেবারেই ইচ্ছে করে না। দুঃখ আর কষ্ট তাতে শুধু বাড়ে বলেই বোধহয় মন থেকে তাকে ছুটি দেয়। নিদারুণ অভিমানেই জোর করে ভুলে থাকা। কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর পনেরোটা বছরের সে তার অতীতের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সব ভুলে গিয়ে সে সংসারে মন দিয়েছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ মধ্যরাতের বাঁশীর সেই সুরে তার সব গোলমাল করে দিল। হারানো পনেরো বছর আগের জীবনের ভেতর আবার সে অনুপ্রবেশ করল, সেই আনন্দ, সেই বেদনা, প্রশ্ন ঠিক তেমন তেমন করে তার মনে আসছে।

যমুনায় কৃষ্ণ তার শরীরটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় এসে ওঠল। সেই থেকে কি যেন হয়ে গেল। কৃষ্ণের শরীরের দপদপানি তার শরীরের মধ্যে অনুভব করল। মানব-মানবীর এই আশ্চর্য শরীরের স্পন্দন সুখানুভূতি বোধহয় সকলের মধ্যে একইভাবে নিহিত আছে। বিয়ের পর আয়ানের সঙ্গে তার কোন দেহ সংসর্গ হয়নি, কিন্তু দেহের কামে প্রবল যাতনা, চোখের তৃষ্ণা কি, সে টের পেত। কিন্তু এরকম কোন অনুভূতি তার হয়নি। মানুষের শরীরের ভিতরেই কত কি অনুভব করার আছে প্রতিটি মুহূর্ত এবং ঘটনার মধ্যে। কিন্তু তার ভিতর এক অস্থিরতা যন্ত্রণা কি শরীরের না মনের? শরীর এবং মনের কষ্ট, যাতনাতো দেহের ভিতরেই প্রকাশ পায়। তাহলে এই অদ্ভুত অনুভূতির উৎস কোথায়? নিজের ভিতরের রহস্যকে তার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল। সত্যিই— সে কি ভ্রষ্টা ? কুলটা ? নষ্টা ?

কত অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা রাধার মাথায় ভীড় করেছিল। চেতনার চারদিকে আতসবাজির উৎক্ষিপ্ত কণার মত তারা ছিটকে যাচ্ছিল। শুয়ে শুয়ে রাধা দেখতে পাচ্ছিল ঘরের ছাদের কড়ি। দুপুরের রোদ রঙীন মেঝেতে পড়ে কাঁপা আলোতে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল ঘরের ভেতরটা।

আয়ানের হঠাৎ চোখ পড়ল রাধার উপর। ইদানীং তাকে সব সময় বড় বিমর্ষ আর চিন্তান্বিত দেখে। দুপুরের প্রায়ই শুয়ে থাকে, আর একরাশ উদাস চোখ নিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আয়ান খুব আশ্চর্য হয। রাধার জন্য তার ভীষণ কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল : আজকাল তোমাকে খুব গম্ভীর দেখি। দুর্যোগের স্মৃতিটা বোধহয় ভুলতে পারছ না। একথা মনে রেখ মানুষ নিজেই তার দুঃখ-যন্ত্রণার স্রষ্টা। অথচ, সে একটু চেষ্টা করলেই সুস্থ শরীব আর সুস্থ মন নিয়ে কি দারুণভাবে বাঁচতে পারে। সংস্কার, বিশ্বাসের যন্ত্রণা নিয়ে দুহাতে ছিনিমিনি খেলে জীবনকে ফুরিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তাতে ফয়সালা হয় না কিছু। জীবন বাঁচার জন্য খরচের খাতায় লিখে তাকে নষ্ট করলে, মনের সুখ কি জোটে? একটাই তো জীবন। যৌবনও তাই। ঐ একটামাত্র জীবনে যে ঘটনাই ঘটুক তার ভেতরেও দারুণ-ভাবে বেঁচে থাকা যায়। জীবন তো আর ছোট নয়। অনেক বড়। কত কি পড়ে আছে তার সামনে।

আয়ানের কথা শুনে রাধা অবাক হয়েছিল। আয়ান কি অন্তর্যামী? কান্না আর হাসির মাঝামাঝি এক রকমের অদ্ভুত অনুভূতিতে ভেসে গিয়ে সে আয়ানের বুকের উপর মাথা রাখল। বলল : আমার ব্যাথাটা যে অন্য জায়গায়। তোমাকে আমার সে লজ্জার কথা বলতে পারছি না। কোন নারী স্বামী ছাড়া অন্যকে শরীর দিতে চায না, দিতে ইচ্ছাও করে না। কিন্তু আমার সব লাজলজ্জা যে কৃষ্ণকে কখন দিয়েছি, নিজেও জানি না। আয়ানের অধরে স্নিগ্ধ হাসির বিজুরী। বলল : শরীরের বহিরঙ্গে নারী পুরুষ কেবল আলাদা। কিন্তু অন্তরঙ্গে তাদের রক্তের রঙ এক। হৃৎপিণ্ডের গঠন, শব্দ সব একই। কোষ ধমনীতেও আলাদা কিছু নেই। অনুভূতি, উপলব্ধি, জীবনধর্মেও তারা এক। ভাব ভালবাসাতেও তাদের পার্থক্য নেই। কেবল সংস্কারের একটা দেওয়াল সৃষ্টি করে নারী-পুরুষের সম্পর্কটুকুও অলাদা করা হয়েছে। উভয়ের সুস্থ

মেলামেশার পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, নারী ও পুরুষ যেন দুটি পৃথক মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি আর মন কষাকষি ভাব তীব্র হয়েছে। কৃষ্ণ এই দেওয়ালটাকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। মানুষী সত্তার যুগলরূপতো নরনারী। যুগলরূপেই নারী ও পুরুষ একটি সম্পূর্ণ মানুষ। শুধু পুরুষ, শুধু নারী মানুষের খণ্ডিত সত্তা। দুটির আত্মার মিলনেই মানুষ পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে। কিন্তু এতকাল ধরে এর উল্টো কথাটাই ভেবে এসেছি আমরা। নারী পুরুষ পৃথিবীর দুই মেরুতে অবস্থিত। সুমেরু এবং কুমেরুর মত চিরদিনই তারা একা। কিন্তু একথা সত্য নয়। বরং দুই মেরুর মাঝের পৃথিবীতে জীবনের যত কলগীতি। কৃষ্ণ সেই মানব মানবীকে নিয়ে এক বসন্তোৎসব করবে শীঘ্রী। কৃষ্ণ আর তুমি যে সেই যুগলরূপের প্রতীক। বিধাতা তাই তোমাদের স্বর্গভ্রষ্টা করেছেন রাধা। রাধা-কৃষ্ণকে না পেলে এত বড় জীবনসত্যটা কোনকালে জানা হত না।

যত দিন যায়, রাধা তবু সংকোচ বোধ করে। প্রেমের অমৃতকে ছাপিয়ে ভয়ের বিস তার সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয়। মথুরার হাটে যাওয়া সে ছেড়ে দিল। বাইরে বেরোন বন্ধ করল।

এদিকে তার অদর্শনে কৃষ্ণ উতলা, চঞ্চল, অস্থির, ধৈর্যহারা। ললিতা বিশাখাকে পাঠাল রাধার সংবাদ আনতে। কৃষ্ণের ব্যাকুলতার কথা শুনে রাধা অবাক হল না মোটে। জ্বালাধরা চোখে বিশাখা ললিতার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা বলতে পারল না। কেমন একটা বিহ্বলতায় সে আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে থাকল।

বিশাখা ললিতা দুজনে তার খুব কাছাকাছি বসে আছে। নীরব অন্ধকার মাখানো আকাশ তাদের ঘিরে আছে। সামনে তাদের নিথর সরোবর। সময়ের মত স্তব্ধ, তরল। সরোবরের

জলেতে তাদের ছায়া দীর্ঘাকৃত। চারদিক নিস্তব্ধ। এক আশ্চর্য প্রশান্তির মধ্যে ডুবে আছে চরাচর। কিন্তু রাধাই কেবল অশান্ত। সরোবরের জলের মত থির থির করে কাঁপছে তার অন্তঃকরণ, তার আশা এবং কামনা।

রাধা চুপ করেছিল। বিধুর হয়ে গিয়েছিল তার দৃষ্টি। কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপল। সম্মোহিতের মত বলল: কৃষ্ণের চেয়ে সাত বছরের বড় আমি। তবু তার সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল। প্রেম তো কখনও ইচ্ছে করে হয় না। মনের ভেতর থেকে সে আসে। যখন তা ঘটে তখন দোষগুণের প্রশ্ন থাকে না। প্রেমের বয়স নেই। তবুতো পরস্ত্রী আমি। কিন্তু সেজন্য কোন অনুশোচনা কিংবা পাপবোধ আমার নেই। থাকবে কেন? ভালবাসায় কোন পাপ হয় না। কৃষ্ণ ছাড়া আমার কি আছে আর? কৃষ্ণ এখন আমার ধ্যান, জ্ঞান , জপ-তপ, মন্ত্র-সাধন সব। ওকে ছেড়ে থাকা আমাব খুব কঠিন। একদিকে সমাজ, অন্য দিকে আমার ভালবাসা। এ দুয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার তাতো একমাত্র বিয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু ওকথা আমার মনেও আসে না। আর বিয়ে আমাদের হবেও না। বিয়ে মানে তো শরীরের মালিকানা। শবীরের মধ্যে কিছু নেই। কোষে কোষে ক্ষুধা, তৃষ্ণা জাগানো আছে। বাইরে থেকে অবশ্য মনে হয়, শরীরটাই বুঝি সব। শরীরটাকেই বুঝি ভালবাসি। কিন্তু না। বিশ্বাস কর বিশাখা আমি কৃষ্ণকে খুঁজছি, কৃষ্ণের আত্মাকেও খুঁজছি। কৃষ্ণ তো তার শরীরেই আছে। আর, যে কৃষ্ণকে চোখে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, অথচ যার অস্তিত্ব সমস্ত অনুভূতির গায়ে বিন্দু বিন্দু আলোর মত স্পন্দিত হতে থাকে। সেই দেহের অতীত কৃষ্ণেব সত্তাকে, আমি পাই কৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে, তাকে স্পর্শ করে এবং কল্পনা করে। এই গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধির কথা ঠিক বোঝানোর নয। কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের মধ্যে যেমন তাব অস্তিত্বেব খবব ভেসে আসে ঠিক সেরকম করে কৃষ্ণ আমার মনোময়। মনেব তো আর

শরীর নেই।

বিশাখা ললিতা কোন কথা বলল না। চুপ করে বসে রইল। তাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে কিছুক্ষণ পরে রাধা বলল: বিশাখা তুই কথা বলছিস না কেন? আমার দিকে তাকাচ্ছিস না কেন? ললিতা তুই অমনি মুখ নীচু করে আছিস কেন? তোর মধ্যে সেই নির্ভীক নিপুণা রসিকা রমণী কোথায় গেল? আজ তোদের দুজনের দশা দেখে আমার আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। সত্যি করে বল, কৃষ্ণ তোদের কি কি বলেছে? আমি কথা দিচ্ছি কৃষ্ণকে বিপদে ফেলব না। ওর কথার অবাধ্যও হব না।

রাধার প্রতিশ্রুতিতে বিশাখার আকাঙ্ক্ষা ধুয়ে-মুছে গেল এক মুহূর্তে। তারপর বলল: মথুরার হাটে যাওয়ার পথে খেয়া নৌকোয় জলদস্যুদের উৎপাত বন্ধ হয়েছে। যুবকদের অস্থিরতা কেটেছে। তাদের মতি-গতি ফিরেছে। তারা এখন কৃষ্ণপ্রাণ। কৃষ্ণের বিশ্বস্ত সৈনিক সব। চতুর্দিকে তাদের কড়া নজর। পথে পথে বিপদের আশঙ্কা এবং ভয় দূর হয়েছে। তবু, তুই মথুরার হাটে যাস না কেন? বেচারা কৃষ্ণ তোকে দেখার জন্য আকুল। রোজ মাঝি সেজে খেয়া নৌকোর দাঁড় বায়। এদিক-ওদিক তাকায়। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেই কৃষ্ণ ধন্য হয়ে যায়। সে শুধু বলে "চোখের লাগিয়া তিয়াসা যাহার সে আঁখি আমার হোক।"

রাধার দুই আঁখি বেদনায় টলমল করতে লাগল। দীর্ঘশ্বাসে বুকের হাহাকার মর্মরিত হল। কণ্ঠস্বর স্খলিত! ভেজা। বলল: শরীরের আনন্দ পেতে আমিও কৃষ্ণকে চাই না। সখী তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, কৃষ্ণ আমার ইচ্ছে পূরণ করতে শরীরের দরজা বন্ধ করে মনের দরজা হাট্ করে খুলে দিয়ে গেল। কিন্তু — কিন্তু আমার বলতে খুব লজ্জা করছে, কে যে কার কাছে অসহায়ের মত হেরে যায় তা যদি আগে থেকে জানত তা হলে এমন ভয় কবত না। সত্যিই বলছি, চন্দ্রাবলীর মত নারী তার

সখী। একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। সত্যি বলছি কৃষ্ণকে বল, আমাকে ভুলে যেতে। সেই হবে আমার প্রতি তাব ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ললিতা স্তব্ধ বিস্ময়ে রাধার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। সুতীব্র একটা কষ্টে দুঃখে, রাগে তার মুখ খানা গন্‌গন্‌ করতে লাগল। খুব কষ্টে নিজের হৃদয়াবেগ দমন করল। চোখ বন্ধ করে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলল : না! এ তোর মিথ্যে নারীসুলভ অভিমান, আর অবিশ্বাস। এব পেছনে কোন যুক্তি নেই। তার বাল্যের স্বপ্ন, প্রথম যৌবনের সব অবুঝ অনাবিল পবিত্র ভালবাসা দিয়ে সে তোকে মনের মধ্যে প্রতিদিন তৈরি করেছে। তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন। তুই তার সাধনার ধন। সাত রাজার এক মানিক। তোকে ফেলে কাঁচকে হীরে ভেবে খুঁটোয় বাঁধার ছেলে সে নয়। তুই তার শক্তি, ভরসা-সব। মথুরার অচল অনড় রথের রশি তোর হাতের ছোঁয়া না পেলে তার বহুকালের জং ধরা চাকা ঘুরবে না। ঘুরবেনা এক পাকও।

রাধার স্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে উঠল বিশাখার। বিব্রত ভয়ে বলল। সে সব কথা ভাল করে বোঝাই এমন বিদ্যে বুদ্ধি আমার নেই। কাল থেকে আবার হাটের পথে আয়। কৃষ্ণ সরল করে তোকে বুঝিয়ে দেবে সব। তোকে ছাড়া আমার ও বড় নিরানন্দ বোধ করি রে। কাল আবার এক সঙ্গে বেরোব, ছুটব, হাসব, গান গাইব; যমুনার জল ছিটোব মনের আনন্দে। কি মজা হবে বলত? আর মনের নাগরের সঙ্গেও তোর চোখাচোখি হবে। চোখের দেখায় তো দোষ নেই। চোখের দেখার অনন্ত সুখ তোর হৃদয়ে ভরে উঠবে।

রাধা উদাস চোখে সরোবরের কাজলকালো জলের দিকে তাকিয়ে রইল। অশ্বত্থ গাছের ছায়া তির্‌ তির্‌ করে কাঁপছিল জলে। জননীর স্নেহের মত অশ্বত্থের ছায়া জড়িয়েছিল সরোবরকে। চারদিকে কি নীরব প্রগাঢ় শান্তি। রাধা অন্তরের মধ্যে অনুভব করল তার আবাল্যের কৃষ্ণকে সন্ধ্যাতারার নরম

নীলাভ দ্যুতিতে, কিশোরীর অপাপবিদ্ধ চোখের উৎসুক চাউনিতে, ললিতা বিশাখার রঙ্গ-রসিকতায়, যশোদার বাৎসল্যে, গোষ্ঠবিহারে দৌড়ে যাওয়ায় গাভীকূলের উড়াল ছন্দে, কুটিলার নিষ্ঠুর ঈর্ষায়, বৃন্দাবনের অগণিত মানুষের সরল শ্রদ্ধা ভক্তিতে।

সেদিনই রাতে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। রাত তখন নিশুতি। কেবল রাধার চোখে ঘুম নেই। যমুনার কূলে কদমতলায় বসে কে যেন চিত্তের হরিষে বাঁশী বাজাচ্ছিল। ঐ বাঁশীব সুর শুনে তার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। ভাল লাগল না শয্যা, গৃহের আকর্ষণ মিথ্যে হয়ে গেল। বুকের ভেতব কেমন একটা উথলে ওঠা ভাব। রাধার মন অশান্ত হল। সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তার সব যুক্তি তর্ক মিথ্যে হয়ে গেল।

চুপি চুপি শয্যা ছেড়ে ওঠল। পায়ের নূপুর কটিভূষণ সব খুলে রাখলো। পরে নিল আঁধার রাতের সঙ্গে মিশিয়ে একটা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি। তারপব অতি সন্তর্পণে গুটি গুটি পায়ে মাটি মাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে।

বাঁশীর শব্দ অনুসরণ করে রাধা নিঃশঙ্কচিত্তে বনের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোতে লাগল। কখন রাতের অন্ধকার ফুরিয়ে যায়, সেই ভেবে সে বিচলিত। সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পদতল তৃণাঙ্কুর ক্ষতবিক্ষত হল। কখন কণ্টকে জড়িয়ে গেল তার নীলাম্বরী। তবু রাধা নিশিপাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আবছা অন্ধকারে ঢাকা বনপথ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। বাঁশীর সুরে বিষাদের সুর যেন ক্রমশ গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। বাধার অন্তরটা কেমন ব্যাথাতুর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন হল। সেই গভীর ব্যথার উজান ঠেলে সে যেন উত্তাল বেদনার নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে দুরন্ত বেগে ধাবিত হতে লাগল।

কৃষ্ণ উদাস চোখ দুটো দূরে শেষ রাত্রির আকাশে অস্তমান

চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের স্বপ্নের ভেতব মগ্ন হয়ে যেমন বাঁশী বাজাচ্ছিল তেমনিভাবেই বাজাতে লাগল।

অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে কৃষ্ণ অবাক চোখে দেখল রাধা উদ্‌ভ্রান্তের মত একজন নিতান্ত দীন অনুগ্রহপ্রার্থীব মত তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার দুহাতে ধরা একটা সুন্দব বেলফুলের মালা, আর কিছু কদমফুলের গুচ্ছ। কৃষ্ণ কিছু বলাব আগেই রাধা তার গলায় পরিয়ে দিল মালা। কয়েক মুহূর্তে কৃষ্ণের হাসি হাসি গোল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর যেন বেদনার সমুদ্র উথাল পাথাল করে ওঠল। আর পারল না রাধা নিজেকে সংযত রাখতে। ঝড়ো বাতাসের মত কৃষ্ণের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণের খোলা বুকেব ওপব মুখ ঢেকে এক অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কি আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে কৃষ্ণেব সাবা শরীর অবশ হয়ে গেল। চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে ডাকল· রাধা! কী মধুব সেই ডাক। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন বড় বড় নীল চোখ মেলে তাকাল রাধা। কৃষ্ণের পরণেও নীল আকাশেব মত বসন। রাধা কেমন যেন হয়ে গেল। গলা দিয়ে তার স্বব বেরোয় না। গভীর অনুশোচনায় পাথরের মত ভারি হয়ে উঠল রাধার মন। প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর মুখে তার কষ্টেব ছাপ। আত্মগ্লানিতে তার অন্তঃকরণ পুড়ছিল। আবেগের বশে যা করেছে ভাল করিনি। ঘরে ফেরার পথ তার বন্ধ হল কি? আস্তে আস্তে বলল: তুমি কেন এমনভাবে পাগল করলে আমাকে? তোমার বাঁশী আমার সব গোলমাল করে দিল। তুমি আমার জীবনের শনি। আজকের এই অবস্থার জন্য তুমি দায়ী। আমি এতই বোকা যে তোমার জন্য আমাব সব হাবাল আজ।

রাধার সুন্দর বাঁকা যুগল ভুরুব মাঝখানে সিঁদুরেব টিপ জ্বল্‌জ্বল্ করছিল। কৃষ্ণ দু'হাতে তার মুখটা নিজের মুখেব খুব কাছে ধরে স্বপ্নালু চোখে দেখতে লাগল। রাধার চোখেব কোণে

জল টলমল করছিল। কৃষ্ণ মুগ্ধ স্বরে বলল: রাধা তোমাকে এমন করে কাছে পেয়ে আমার মন যে কি অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেছে তা তো তোমাকে বোঝাতে পারব না।

রাধাব মুখে চোখে কেমন উদাস অন্যমনস্কতা। কি যে ভাবছিল সে, কে জানে? কৃষ্ণের মুগ্ধ নয়নকোণ থেকে আঁখিতারা সরিয়ে নিতে পারল না। এই ক্ষণটুকু শুধু চিরকাল হয়ে থাক এই আর্তি আকুল করে তুলেছিল রাধাকে। কৃষ্ণের সান্নিধ্য, স্পর্শ, একটা মৃদু সুগন্ধের মত তার মন ছেয়েছিল।

এক দারুণ মুগ্ধ চমকে কৃষ্ণের মুখ চোখ চক্ চক্ করছিল। স্মিত হেসে বলল: রাধা ভয়, ভীরুতা আর লজ্জা মানুষের জীবনে এক দুরন্ত রিপু। এ শুধু মানুষকে বিচ্ছিন্ন আর একা করে রাখে। প্রতিদিনই সে হারানোর ভয়ে বিব্রত। এমন করে একজন মানুষ কি বাঁচতে পারে? যে হারায় তার মত সুখী আর কে আছে? নতুন করে হাবানোর তার কোন ভয় থাকে না আর। তুমি এখন থেকে নিঃশঙ্ক হলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ দূর হল। তোমার আর কোন বন্ধন রইল না। তুমি মুক্ত স্বাধীন। এখন তুমি নিজেকে পূর্ণতর করে মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে হৃদয় ডমরু বাজাবে—ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে জীবন অর্ঘ্য সাজাবে। কথাগুলো বলতে বলতে কৃষ্ণ কেমন ভাবাবিষ্ট হয়ে গেল।

রাধার শরীর ও মন জুড়িয়ে গেল। কি এক পরম প্রাপ্তির অনাবিল সুর ও আনন্দে রাধার ভিতরটা টৈটম্বুর হয়ে গেল। অভিভূত গলায় বলল: এ তো ইচ্ছে করেই আমায় কষ্ট দেওয়া তোমার। আমি জানি সব দিক থেকে এক অসীম শূন্যতা আমাকে ছেয়ে আছে। আমি জানি, আমার স্বামী এমন মানুষ যে, কেউ কোনভাবে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কিন্তু আমি বিভ্রান্ত হতে পারি। আমার মধ্যে নানারকম দুর্বলতা। আমি নিজের ভেতর একজন প্রহরী বসিয়ে রেখেছি, পাছে না হারাই।

কৃষ্ণের অধরে স্নিগ্ধ হাসি ঝকঝক করতে লাগল। বলল:

এখন তুমি হৃদয় পানে চোখ মেলেছ, বাহির পানে চাওনি।

অবচেতনের গভীর থেকে মন্ত্রোচ্চারণের মত অসহায়ে উচ্চারণ করল। তোমার সব কথার মানে বুঝতে পারি না। কিন্তু তোমার কথা শুনলে হৃদয় বিকশিত হয়, মন প্রসারিত হয়ে যায়। মনের ভেতরটা একটা অদ্ভুত আবেগে কম্পমান হয়। সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে উঠে। প্রিয় প্রিয়তর হয়, এমন কি অপ্রিয়ও প্রিয় হয়।

কৃষ্ণের মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এসেছে কখন। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। কৃষ্ণ তার গাঢ় গভীর গলায় বলল: রাধা, এ হল তোমার মুগ্ধ বিশ্বাসের উপলব্ধি। প্রেমের মধ্যে যদি বিশ্বাস হারিয়ে যায় তাহলে রইল কি? সৌন্দর্য ছাড়া সত্যের রূপ যেমন কুৎসিৎ তেমনি বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের রূপও ভয়ংকর। এই কথাটা তোমার অদর্শনে আমাকে ভয়ংকরভাবে বিঁধছিল।

ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ রাধার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল। মৃদুস্বরে বলল: কিন্তু আমি যে তোমাকে এড়াতে চাই। তোমাকে আমার বড় ভয়। ভয় এই কারণে যে, তুমি এত তীব্রভাবে চাও যে 'না' বলতে বুক ভেঙে যায়। কেন বোঝ না আমার স্বামী আছে।

রাধা বেশ বুঝতে পারছিল কৃষ্ণ কিছু বলতে চায়। তার বুকের ভিতর চিনচিনে ভয় ও শঙ্কা মুখের অভিব্যক্তিতে সে দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু কৃষ্ণকে প্রশ্নের কোন অবকাশ না দিয়েই নিজের মনে বলল: সেজন্য মনে একটা দারুণ লজ্জা আর অভিমান। আমার বুকে সবচেয়ে বিঁধে তার পৌরুষের অভাব। তার কাছে আমার কোন আড়াল নেই, বাধা নেই। এই তো আমার সতীত্বের বড় অপমান। নিজের লজ্জায় নিজেই মরে থাকি। আমার ভেতর নারীর সংস্কার-বিশ্বাস আমাকে দগ্ধ করে, কিন্তু তাতে আমার স্বামী তো উজ্জ্বল হয়ে উঠে না।

কৃষ্ণ স্থির চোখে রাধাকে দেখল। চোখ দুটিতে তার গভীর

তন্ময়তা। ধীরে বলল· আয়ান মহান।

রাধার বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস নামল। আচ্ছন্ন গলায় বলল: স্বামী শুধু মহান নয়, সে কৃষ্ণপ্রাণ। আমার কোন কথাই ভাল করে বুঝতে চায় না। মা যেমন নিজের অলঙ্কার দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেয় তেমনি তার মহান প্রেম দিয়ে আমাকে নিবেদন করেছে কৃষ্ণ সেবায়। কিন্তু আমি তো মেয়ে। কেমন করে নিজের ঘরে নিজের সুবিধের জন্য আগুন লাগাই বল। তাই তো সমস্ত চোখ কান মুড়ে রাখলাম, নিজেকে ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখলাম। সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই বলে মথুরার হাটে যাই না। ঘরের বহিরেও বার হই না। তুমি তো চন্দ্রাবলীর প্রেমে মশগুল। আমাকে তোমার কি দরকার?

কৃষ্ণের অধরে বঙ্কিম হাসি। লোকে বলে রাধা তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আর আমি গোলকপতি। সত্য মিথ্যে জানি না। তবু একদিন আমাদের দেখা হল। মনে হল, কত জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক আমাদের। তারপর, একদিন জীবনের দুর্যোগ এল, প্রকৃতির উন্মাদনা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক স্রোতে। তুমি আমি একদেহে লীন হয়ে গেলাম। আমার আমিত্বটুকু তোমাকে দিয়ে যে কখন নিঃস্ব হয়ে গেছি জানি না। তাই বাঁশী শুধু বলে রাধা রাধা। বন, উপবন ব্যাকুল বাঁশীর সুরে আহা, আহা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রাধার বুকের ভেতর কেমন উথলে উঠার ভাব হয়। পুলকে আকুল হল তার সারা অঙ্গ। প্রেম মুগ্ধ গলায় বলল: প্রিয়, তোমার পাগল করা ওই বাঁশীর সুর আমার বুকের দরজায় এসে ঘা মারে, জোরে জোরে কড়া নাড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা চলে তখন। কিন্তু যে লুকোচুরি খেলায় পালিয়ে থেকেও ইচ্ছে করে চোরকে ধরা দিতে হয়. তখন সে খেলার আর কোন সার্থকতা থাকে? থাকে না। থাকবে কোথা থেকে বল? মনের দরজায় এসে বাঁশী যখন রাধা, রাধা করে ডাকে তখন আমার মন শরীর আর ঠিক

রাখতে পারি না। সমস্ত অন্তরটা কেমন কাঙাল হয়ে যায়। ভিখারীর মত দ্বারে দাঁড়িয়ে সে শুধু ভিক্ষে চাইছে। অনবরত চোখের জলে ভেজা নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি করে ফিরিয়ে দেই বল?

কৃষ্ণের অধরে বিগলিত হাসির প্রসন্নতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। মধুর গলায় বলল: তোমার আমার এই মধুর মিলন অনন্তকালের। এ মিলনই ছিল নিয়তির বিধান।

ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের শিহরণে রাধার চোখ মুখ উজ্জ্বল হল। শ্বাস দ্রুত হল। আস্তে আস্তে বলল: সে তোমাকে মনে রাখেনি।

কার কথা বলছ রাধা?

তোমার চন্দ্রাবলী, কুব্জা-

প্রত্যাশায় ব্যথা লাগার চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: রাধা! যেমন আকাশের চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়ে তোমার ঐ ললাট অভিষিক্ত করছে তেমনি আমার প্রেমের পরশে দেশেব নারীচিত্তের নবজন্ম হয়েছে। আজ দেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীচিত্তের অভিষেক চাই। নইলে, তার রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে? বড় জায়গায় এসে জীবনকে যখন বড় করে দেখতে পাবে তখন মনের এই দৌরাত্ম্যের মুক্তি হবে। নিজের ভুল নিজের কাছে ধরা পড়বে। তখনই মুক্তি, পরিপূর্ণ মুক্তি।

এত অপূর্ব আনন্দে রাধার মনে অহংকারের দীপ্তি নিভে গেল। ভিতরে একটা ঝড়ের বেগ তাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল।

কৃষ্ণেব বুকেও ঘটনার বৃত্তান্ত মোহ সৃষ্টি করছিল। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলেছে তাকে অন্য এক অপার্থিব অমরলোকে। উজান বাইবার শক্তি তার ছিল না। সে ভেসে যাচ্ছিল এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তিব নির্দেশে। সহসা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ আলতোভাবে রাধাকে টানল তার বাম পাশে। পাশাপাশি তারা দাঁড়াল এক অদ্ভুত যুগল-মূর্তিতে। মোহন বেণুতে কৃষ্ণ ও রাধা হাত ধরাধরি করে

ধরল দুজনে। পাশাপাশি দুটি শরীর স্থির। চোখে তাদের কি অপরূপ মুগ্ধতা! মুখে পূর্ণতার হাসি।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বিদায় নিতে নিতে থমকে দাঁড়াল! গাছের শাখায় শাখায় পাখিরা কলরব করে ওঠল। অবাক মুগ্ধতা নিয়ে রাতের আকাশ চেয়ে রইল যুগল রূপের দিকে। বিধাতা যেন তাদের নতুন করে সৃষ্টি করল। তাই, লক্ষ লক্ষ তারার চোখ দ্যুতিময় হয়ে উঠল। সমীরণ উতলা হল। বন-উপবন পূজার প্রদীপের মত অপলক চেয়ে রইল।

রাধা অনুভব করল তার মধ্যে একটা দিব্যশক্তি এসেছে, সে এমন একটা কিছু যাকে আগে কখনও অনুভব করিনি। অন্তরের মধ্যে হঠাৎ এই যে একটা বিপুল আবেগ সঞ্চার হল, এ জিনিষটা কি? নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনুভব করল, এ যেন তার ভিতর এতকাল ঘুমিয়েছিল, এ তার নিজেরই, সম্পূর্ণ নিজের। তবু মনে হল, এ তার সম্পূর্ণ নিজের নয়, এ তার দেশের। তবে কি দেশের জন্য কৃষ্ণ তারও অভিষেক করল? না হ'লে এমন করে বুকের ভেতর সমস্ত জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পরিবর্তনবোধ জাগবে কেন? কেমন যেন হয়ে গেল রাধা। তার শুদ্ধ মন তখন মিলনের আনন্দে থর থর করে কাঁপছে। মুগ্ধ স্বরে বলল: ওগো প্রিয়, প্রিয় আমার তোমার হৃদয়ের পরশমনি ছোঁয়ার আগে বসন্তের আকাশে এত মাধুরী ছিল না। এখন আমার সকল ভালবাসা কৃষ্ণরূপে উঠল হাসি। যখন দেখা দাওনি তুমি। তখন বাজিয়েছিলে তোমার বাঁশী। এখন চোখে চোখে চেয়ে তার সুর যে শুধু কাঁদায় আসি।

সূর্যোদয়ের আগেই রাধা ঘরে ফিরল। কিন্তু স্মৃতিতে বিভোর কৃষ্ণের কথাগুলো অনুক্ষণ তার কানে অনুরণিত হতে লাগল। কত অনুযোগ আর অভিযোগ কৃষ্ণের। সে সব কথায় ধমনীর রক্তস্রোত কিছু উদ্দাম হল। বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ডেকে উঠল। নিজের মধ্যে এক বেসামাল ভাব টের

পেল। মনটা পাখির মত কেমন পালাই পালাই করতে লাগল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা নিশি পাওয়ার ভাব হল রাধার। প্রত্যেকে যে যার কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিন্তু রাধার ঘুম এল না। জানলার দিকে তাকিয়ে সংকেতের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। হঠাৎ অন্ধকারে দীপ জ্বলে নিভে গেল। চুপি চুপি রাধা শয্যা ছেড়ে গৃহের বাইরে বেরোল।

অন্ধকার পথ। নির্জন। লোকের চিহ্ন নেই পথে। চরাচর ঘুমুচ্ছে। কেবল রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রাধার কোন ভয় নেই। লক্ষ লক্ষ জোনাকী যেন তার পথে আলো জ্বেলে দিয়েছে। আর সে নিশি পাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ঝাপসা অন্ধকার ঢাকা পথ দিয়ে উন্মত্তের মত চলেছে। মনের অনেক অনেক নীচে গহন লোকের গূঢ় কথা তো বলে বোঝানো যায় না। রাধাও নিজেব এই যাত্রাকে কোন কথা দিয়ে প্রবোধ দিতে পারল না। বুকের ভেতর সে মহৎ আর জ্যোতির্ময় এক সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করল।

অস্পষ্ট এক অন্ধকারে ছায়ামূর্তিকে দেখে রাধা চমকে ওঠেছিল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। কৃষ্ণ ডাকল : রাধা!

কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ যেন সদ্য ঘুম থেকে ওঠেছে। রাধার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর পড়েছে তার আলো। কৃষ্ণ বিভোর চোখে দেখছে রাধাকে। মাঝখানে মাত্র একটা দিন গেছে। তবু মনে হল যেন, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ পর তাবা পরস্পরকে দেখছে। দুচোখ জুড়ে তাদের তৃষ্ণা। রাধার ঠোঁট কাঁপছে। দেহের ভেতর চন্‌চন্‌ করছে। কৃষ্ণের দুচোখে বিহ্বলতা। হাসি হাসি ভাব। হঠাৎ ঝিরঝিরে বাতাস এল পরীদের মত। ডালে ডালে পড়ে গেল হুড়োহুড়ি। রাশি রাশি ফুলের পাঁপড়ি খসে পড়ল কদম্বের শাখা থেকে। কৃষ্ণ মুগ্ধস্বরে উচ্চারণ করল: মধু, মধুময় সব।

রাধার তবু মনে হর্ষ জাগে। শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার বুকের ভেতর যেন ঢেউ দিয়ে গেল। রাধা কৃষ্ণের

বুকের ওপর মাথা রাখল। কৃষ্ণ তাকে দুহাতে নিজের বুকেতে টেনে নিয়ে বলল: দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, আমি যে শুধু তোমার কথা ভাবি রাধা। তুমি যে আমার কে জানি না। তবু তোমার কথা ভাবতে, তোমার স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে।

কেমন একটা লজ্জা নাড়া দেয় রাধাকে। বাতাসে তার বুকের আঁচল অনেকখানি খুলে গেল। সেদিকে তার খেয়াল রইল না। মুখখানা তার কৃষ্ণের মুখের দিকে অনেকখানি তোলা। চোখের তারায় তার স্বপ্নের ঘুম ভাব। নিশ্বাস বুকের খুব কাছে আটকে থাকে। আস্তে আস্তে বলল: তুমি আমার ধ্যানের দেবতা ওগো। বহু ভাগ্যে তোমাকে পেয়েছি।

রাধার অধর স্পর্শ করার জন্য কৃষ্ণের মুখ নেমে আসে তার মুখের খুব কাছে। কিন্তু রাধা লজ্জাবশত তার মুখখানা সরিয়ে নিল। মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা করে বলল: ছিঃ!

বঞ্চনার কষ্টে কৃষ্ণের চোখ ছলছল করে ওঠল। তীব্র অভিমানবোধে বুক তার টাটাচ্ছিল। নিজেকে তার বড় প্রত্যাখ্যাত ও ছোট মনে হল। একটা সুতীব্র অপমানবোধ তার মনে এমন গভীরভাবে বেজেছিল যে চকিত বিদ্ধ ব্যথার সঙ্গে সে তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসল রাধার ঠিক পায়ের কাছে। দেবীর সামনে ভক্ত তার অসংখ্য কামনা বাসনা নিবেদনের জন্য যেমন করে বসে অনেকটা সেই ভঙ্গিতে বসল। কাতরকণ্ঠে দীন ভিখারীর মত বলল: রাধা আমায় তুমি করুণা কর। তোমার তো ঐশ্বর্যের, সম্পদের অভাব নেই। প্রকৃতি তার তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে তোমাকে সাজিয়েছে। সাগরের মত তোমার হৃদয় টলটল করছে। আমি যদি তা থেকে এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই, তাহলে সাগর কি রিক্ত হয়ে যাবে? বল, রাধা? বল? হিমাদ্রির শিখরের মত তোমার দুই কুচযুগের মধ্যস্থলে যদি একটু আশ্রয় চাই তাহলে হিমাদ্রি কি কৃপণ হবে? তোমার বঙ্কিম অধরে চন্দ্রের নির্মল কৌতুক চকোরের মত যদি সুধাপান করি তাহলে কি লাজরক্ত হবে সে? রাধা, কেন

বোঝ না, তুমি আমার জীবন। আমার তৃষ্ণা। আমার ইহকাল, পরকাল। তোমার সামান্য করুণা পেলে যার জীবন ধন্য হয়ে যেত, তাকে অবহেলা করে কেন কষ্ট দাও? তুমি তো কোন কালে নিষ্ঠুর নও?

রাধার অধরে গর্বিত হাসি। চোখে কৌতুক; মুখে মুগ্ধতা। কৃষ্ণের স্তুতি সমস্ত মস্তিষ্কের ভিতর একটি স্ফূরিত ঝংকার হয়ে বেজে যাচ্ছিল। এক উত্তেজিত আচ্ছন্ন চেতনায় সে ত্রাস্ত হয়েছিল। কৃষ্ণের প্রশংসা তার সমস্ত অভিব্যক্তি নিমেষে বদলে গিয়েছিল। শুধু নিজের কাছে ভাললাগা ও লজ্জা একসময় তার মুখের চোখের রূপ বদলে দিল। কেমন একটা খুশি আর গৌরববোধ মনে জাগছিল। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। কোমল নরম লজ্জায় তার সারা মুখখানা রাঙা হয়ে গিয়েছিল। কপট ক্রোধে বলল: দেবতারা সব চেয়ে আছে, গাছেরা, পাহাড়েরা, আকাশ রাত্রি সব চেয়ে চেয়ে দেখছে। এদের সামনে এমন করে ভালবাসা, কাঙালপনা দেখালে কৃষ্ণ নামের গৌরব মহিমা কিছু থাকে? শরীরের মধ্যে সম্পর্ককে টেনে এনে এমন সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে দিও না। শরীরের মধ্যে কিছু নেই। সত্যি কিছু নেই। এই যে চোখে চোখে চেয়ে থাকা, এই যে শরীর মন আন্দোলিত হচ্ছে, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ভেতরটা উন্মাদনায় ভরে যাচ্ছে, হৃদয়টা কী এক নেশায় টৈটম্বুর হচ্ছে, মৃগনাভির মত আকুল করা সুখের গন্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসে মাখামাখি হয়ে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি সুখের উল্লাসে কলসের মত মনটা ভরে তুলছে এ কি কম পাওয়া জীবনে? অপমানে, প্রত্যাখ্যানে ক্লিষ্ট হয়ে মনের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বাচ্চা ছেলের মত সে তার দাবী আদায় করে নেয় ঠিকই কিন্তু সে যে কত অসহায় দান আর অবহেলার কৃপা, দাক্ষিণ্য, চিন্তা করলে কষ্ট হয়। আমার কৃষ্ণকে ছোট হতে দেব না।

কৃষ্ণের মুখে কথা সরল না। চোখে তার নীরব হাসি। রাধা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল গভীর করে এসব

কথা ভাববার সময় পায়নি। রাধা তার বড় সুন্দর, বড় স্বপ্নের আবেগকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রেমের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। সচেতনতায় ফিরল কৃষ্ণ। মুখে তার অনুশোচনার হাসি। মৃদুকণ্ঠে ডাকল: রাধা, আয়ত্তের মধ্যে যা থাকে তাতে ভোগের অধিকার অবাধ। তার সৌন্দর্যও বোধ হয় লোভী মানুষের অত্যাচার এড়াতে পারে না। তাই সদাই ভয়। আমাদের সীমাবদ্ধ প্রেমে বসন্তোৎসবের তরঙ্গ যখন এসে লাগবে তখন সত্যিকারে তার রূপ কেমন নেবে দেখতে ও জানতেই এই প্রেম প্রেম খেলা তোমার সঙ্গে।

রাধার চোখে বিস্ময়, মুখে টেপা হাসি। প্রতিবাদ করল না। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল: পুরুষের চোখ-মুখ-চেহারা দেখলে মেয়েরা আগে থাকতে অনেক কিছু টের পায়। উন্মত্ত মতিচ্ছন্ন পুরুষ তা জানতেও পারে না। কিন্তু আশ্চর্য সেই মুহূর্তকে চিনতে কোন মেয়েই ভুল করে না। মেয়েরা সবচেয়ে বেশি জানে স্বপ্নের সুগন্ধ ছড়িয়ে মরণ আসে নিভৃতে। পায়ে পায়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। অজান্তে অজ্ঞাতসারে শরীরের গোপন স্নিগ্ধ সুগন্ধ প্রান্তরের নিভৃতে কুঁড়িগুলিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে সে নিঃশব্দে সরে পড়ে। স্বপ্নের কুঠরী থেকে ধাক্কা খেয়ে বাইরে ছিটকে পড়ার পর তোমারও সম্বিৎ ফিরেছে। তোমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা, বঞ্চনার কষ্ট, তোমার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর কখনও মিথ্যে বলবে না। তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ বন্ধু। মিথ্যে কতকগুলো কৈফিয়ৎ দিয়ে তুমি আমাকে ছলনা কর না। তোমার মিথ্যে আচরণ আমাকে শুধু কষ্ট দেয়। একবার তুমি সত্যি করে বল এসব তোমার অভিনয়, এগুলো কিছুই সত্য নয়!

কৃষ্ণ একটা বিচ্ছুর হাসি হেসে বলল: তাহলে খুশি হবে?

হবো। তা-হলে এমন খুশি হব যে, যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ জুড়বো।

রাধার কথাশুনে কৃষ্ণ যেমন অবাক তেমনি বিপন্ন। কৃষ্ণ

কিছুক্ষণ থম ধবে বসে রইল চুপচাপ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: রাধা, তোমার সমস্যা একটাই। আমি অভিনয় করছি, মিথ্যে বলছি, শুধু এই স্বীকারোক্তি শুনলেই বোধ কবি তোমার সমস্যাটা মিটে যায়। কিন্তু আমাব সমস্যা অত সরল নয়। তোমাকে না হলে আমার প্রেম হত মিছে। তোমাকে একা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করার ভেতর কোন মিথ্যে নেই। সৌন্দর্য আনন্দ, ভোগ-উপভোগ প্রকৃতিরই নিয়ম! সেই নিয়মের ভিতর দিয়ে সংসারী, বিষয়ী, ভোগী, সাধু, সকলে চলছে বলে একটি মানুষও আসলে হয়ে যায় অনেকগুলি মানুষের সমষ্টিমাত্র। আমি যদি এটা বলি, তোমার সৌন্দর্যে অভিভূত যে প্রাণ মন আমার তোমার দিকে ধেয়ে গিয়েছিল সে আমি নই তাহলে কি তত্ত্বগতভাবে ভুল হবে? না সময়ের দ্রুতগতিতে এত দ্রুত, ঘটছে সব যে চোখ যেমন তা ধরতে পারে না, তেমনি যুক্তিতর্ক দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। রাধা, চেয়ে দ্যাখ, এই নির্জন বনভূমি আকাশ, তারা, অন্ধকার আর কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্নায় গাছ পালা সব একাত্ম হয়ে সূর্যোদয়ের তপস্যা করছে। অমন একাত্ম আর ভেদ জ্ঞান লুপ্ত না হলে'তো আমরা কংসের কারাগার ভাঙতে পারব না। সামনের বসন্তোৎসবে তার সূচনা হবে। কিন্তু তার আগে নারী-পুরুষের মেলামেশার ভিতরটা কত দৃঢ় আর নির্ভয় হলে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় সেটাই ছিল আমার জানার ইচ্ছে। নারীর মহাশক্তি আমাদের জাগ্রত করে আর তার মোহ আমাদের বিনাশ করে। কিন্তু তোমার প্রেম মরণ নৃত্যের নূপুর ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছে আমার হৃৎপিন্ডে। মুহূর্তের ভ্রমে যে পরমকে হারাতে বসেছিলাম ঠিক সেই সময় তোমার মন্ত্র উদ্যত হল, তাতে তোমার পূজা ও পূজারী রক্ষা পেল একসঙ্গে। সত্যের কঠোর পরীক্ষায় তাপসদের সামনে এমন কত ভুলের মাতলামি যে তাদের পথভ্রষ্ট করবে, সে কথা ভেবে আমার অন্তঃকরণটা শিউরে ওঠছে।

বিস্ময় আর অপরাধবোধে নিথর কৃষ্ণকে শাপগ্রস্ত প্রস্তরীভূত দেবমূর্তির মত লাগছিল। রাধার অধর কোণে এক চিলতে হাসি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতই বঙ্কিম, শুভ্র এবং নিষ্পাপ। মৃদু হাস্যে বলল: মানুষ বড় আশ্চর্য। তাকে নিয়ে কি প্রচন্ড রহস্যই না তৈরী হয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষের তো নিজের একটা দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব কাউকে শেখানোর জিনিস নয়। দায়িত্ব, ব্যক্তিগত সংযম, বিবেক বোধ মানুষের ভেতর থেকে আসে!

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল কৃষ্ণ। কিন্তু যতদূর সম্ভব নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর কৃষ্ণ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল: দ্যাখ রাধা, একটা সুন্দর কৌতূহলী কাঠবিড়ালী চেয়ে আছে আমাদের দিকে, কি ভাবছে, কে জানে? কিন্তু বিশ্বাস কর রাধা; আমি তোমার শরীরকে নয় শরীরের ভেতর যে আত্মা আছে তাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছি।

তৎক্ষণাৎ শরীরের সব রক্ত যেন হঠাৎ দৌড়ে এল মুখে। রাধা এক তীব্র আনন্দ এবং হঠাৎ আসা একটা তীব্র অপরাধবোধ মিলেমিশে ওর রাঙা হওয়া মুখ যেন পরম প্রার্থনার মত কৃষ্ণের চোখের উপর বিদ্ধ। হঠাৎ কৃষ্ণ রাধার হাত ধরল। শুকনো পাতায় মর্মর তুলে অন্ধকারের ভেতর হাঁটতে লাগল। পথে যেতে যেতে রাধা বলল: কৃষ্ণ আমার এ কি হল? আমি নিজেই জানি না আমি কখন এলাম তোমার কাছে। কেন এলাম, তাও বুঝলাম না। আমায় যেন নিশি পেয়েছে।

না, এ স্বপ্ন নয়, এ সত্য। তোমায় না হলে আমার প্রেম হত মিছে। তাই তো আমার এত আনন্দ তোমার'পর। তোমার ভেতর আমি খুঁজে পেয়েছি নিজেকে। আমার প্রেমকে, আমার প্রিয়াকে, আমার দেশকে।

অমন করে বল না। আমাকে পাগল করে দিও না। রাত শেষ হয়ে এসেছে। এবার আমাকে ঘরে ফিরতে হবে।

—রাধার চোখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। রয়েছে আকুতি সব মিলিয়ে এক পবিত্র সৌন্দর্য।



পনেরো বছর পর বসন্তোৎসবের এই স্মৃতি বুকেব মধ্যে তরঙ্গিত হতে লাগল। পনের বছর আগে যা ঘটেছে এখন মনের ভেতর বাস্তব অস্তিত্ব অম্লান। কালের ক্ষয়, ধ্বংস কাটিয়ে সে কালজয়ী হয়ে আছে মনের ভেতর। বিস্মৃতিই মৃত্যু। কিন্তু তার সমস্ত সত্তার সঙ্গে যা মিশে আছে তাকে বিস্মৃত হওয়া কি সহজ কথা? স্মৃতি শুধু বেদনার। কষ্ট যতই প্রবল হোক তাকে অন্তরের ভিতর অনুভব করার এক আশ্চর্য সুখ মৃগনাভির গন্ধের মত রাধার সমস্ত চেতনাকে আকুল করে তোলে। মনের ঢাকনা যেন খুলে গেল তার একেবারে। ছায়ামূর্তির মত মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত

ব্যাপারটাকেই যেন বাস্তব করে তোলে। কিন্তু অনুভূতির এই প্রত্যক্ষতা কিছুতে সেই ভাষা দিতে পারে না। হয়তো এ ধরণের অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

রাত্রি গভীর হয়েছে। নিশাবসানের গাঢ় অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন। বাঁশীর সুরে বিষাদের সুর ক্রমশ গভীর হয়ে উঠতে লাগল। তার সত্তাকে যেন মন্ত্রাবিষ্ট করল। সে একটু একটু করে তার স্মৃতির ভেতর ডুবে গেল।

হোলির উৎসবের প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। কারণ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রকে নির্মল আর পরম সুন্দর করে তোলার এক নতুন জীবনাভূতির দ্বার খুলে দিল সুবল, সুদামা, ললিতা, বিশাখা, রাধা এবং কৃষ্ণ নিজে। প্রেম সূর্যের মত উজ্জ্বল, ভাস্বর। প্রেমের পুজোয় কোন কিছুই অপবিত্র হয় না। প্রেম নির্মল, নিষ্পাপ। প্রেমে কোন ভেদাভেদ নেই। প্রেমে সকলে মিত্র হয়। শত্রুও আপন হয়। প্রেম হৃদয় অন্ধকারকে আলোকিত করে। মনের ক্লেদ, বিকৃতি, প্রেমেই মুক্ত হয়! বায়ুর মত হিল্লোলিত করে জীবনকে। নিরানন্দ প্রাণহীন দেশে একমাত্র মুক্ত প্রেমই বহিয়ে দিতে পাবে আনন্দ স্রোত। একমাত্র প্রেম দিতে পারে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস, নির্ভরতা শক্তি। কৃষ্ণের মহান প্রেম, ভালোবাসায় শুধু বৃন্দাবনবাসী নয়, মথুরায় সব মানুষ তাদের জীবনের ফাঁক ও ফাঁকি দেখে নির্মল প্রণয়ের দীপ জ্বালাতে বসন্তোৎসবের বেদীতলে সমবেত হল।

সে দিনটা স্পষ্ট মনে আছে রাধার। সে এক বিস্ময়কর দিন। বৃন্দাবনের কোন মানুষ সেই দিনটার কথা ভুলবে? তার কর্মফল এখনও তাকে স্পর্শ করে আছে। বুকের ভেতর তার স্মৃতির দীপ জ্বলজ্বল করে জ্বলে।

রাধা স্তম্ভিত। জীবনে এই প্রথম বোধহয় মথুরা-বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিশুদ্ধ ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাসে নির্ভয় হয়ে যেন বসন্তোৎসবে এসেছে। হাত

ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। চোখে তাদের তন্ময়তা! কি সুন্দব আর মিষ্টি দৃষ্টি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে প্রত্যেকের বাসন্তী রঙের কাপড় বুকে সবুজ উড়নী। আর মেয়েদের বসন হল লাল আর তাদের রক্ষাবরণী হল সবুজ রঙের রেশমী কাপড়। বিশাল প্রান্তরটার দিকে তাকালে বুকেব ভেতরটা কেমন্ আনন্দে নেচে ওঠে।

রাধা তার বিগত পনেরো বছর আগের এই ঘটনার ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুর স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দে বুকের ভেতর কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। আর তীব্র আবেগে তার অন্তরটা যেন মহাপ্রাণ কৃষ্ণের এক অখন্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। তার বুকের ভেতর কৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি বাজতে লাগল।

বসন্তোৎসবে বৃন্দাবন এবং মথুরা নতুন সাজে সেজেছে। নৃত্যস্থলীর বেদীতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। রাধা-কৃষ্ণ দুজনে ধরেছে মোহন মুরলী। বাঁশীতে কৃষ্ণের মুখ। সহসা সমুদ্র তরঙ্গ যেন কল্লোলিত হল বাঁশীর সুরে। গভীর সুখানুভূতির আবেশে কৃষ্ণের দুই চোখ বুজে গেল। মুখমন্ডলে উজ্জ্বল হাসির দীপ্তিচ্ছটা। বাঁশীর মূর্ছনার ভেতর হারিযে গেল রাধার চেতনা। দুচোখে তার স্বপ্নের ঘুম নামল যেন। পূজারিণীর বিনম্র ভঙ্গিতে রাধা প্রথমে কৃষ্ণকে ফাগে ফাগে রাঙিয়ে দিল। অমনি শুরু হয়ে গেল হোলির উৎসব। বিচিত্র হর্ষধ্বনি উঠল বাতাস ভেদ করে। সে জয়ধ্বনি মন্ত্রের মত অভিভূত করল। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে বিচারহীনভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে ফাগখেলায় মেতে উঠল। অনির্বচনীয় সুখ, তৃপ্তি আর অনাবিল আনন্দে তারা মাতোয়ারা। প্রেমে সব সুন্দর। বৃন্দাবনের সব মানুষ পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম নিয়ে পরম নির্ভয়ে আর নিশ্চিন্ত সুখেব উল্লাসে

যেন কৃষ্ণেব অনন্ত মহিমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করল। নিবেদন করার এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে ওঠল তাদের উল্লাসে, আনন্দে, অস্থিরতায়। রাধার বুকের ভেতরও যেন সমুদ্রের উথাল-পাথাল ভাব। কৃষ্ণ তার মঞ্চ থেকে নেমে এসে পরম আদরে রাধাকে নিজের বামপাশে নিয়ে গোটা নৃত্যস্থলীর মানুষের সঙ্গে মিশে গেল। তার মিষ্টি বাঁশীর সুরে বাতাস আকুল হল, নৃত্যস্থলী যেন সমুদ্রের দোলায় দুলতে লাগল।

সর্বত্র নর-নারীর দ্বৈতভঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রাণের আবেগের সে গানে গলা না থাকলেও বেমানান লাগছিল না। বসন্তোৎসবের গানে, নৃত্যে, ছন্দে, বৃন্দাবনের মরা প্রাণে হঠাৎ জোয়ার এসে লাগল। প্রত্যেকের জীবনের ভেতর এসে ঢুকল তার স্রোত। মনে হল মহাকালের রথ এসেছে বৃন্দাবনে। তার সেই চাকার শব্দ বৃন্দাবনের মানুষের বুকের ভেতর গুরুগুরু, করতে লাগল। প্রতি মুহূর্ত বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে হতে লাগল একটা কি পরমাশ্চর্য যেন এসে পড়ল তাদের জীবনে। ঘরে যে ছিল তারও ঘরে থাকা দায় হল। নারী-পুরুষের সংস্কার, পার্থক্য সব ভেসে গেল। উভয়ের মাঝখানের বহু কালের দেয়ালটাও ধসে গেল। পথের সব বাধাই হঠাৎ সরে গেল যেন। এই অবাধ মেলামেশায় কোন লজ্জা ছিল না, কৈফিয়ৎ ছিল না। মুক্ত জীবন আর মুক্ত প্রেমের আশীর্বাদ দেবতার অকৃপণ দানের মত এল।

কৃষ্ণ সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিল বাঁশীর সুর যেন গোটা বৃন্দাবনবাসীর সমস্ত শিরায়-উপশিরায় কুহরে কুহরে বাজিয়ে তোলে রুদ্রের ডমরুধ্বনি। তার ভেতর সকল সৃষ্টি ছাড়াটা যেন জেগে উঠে। এগিয়ে চলার মন্ত্র মুখে তার: চরৈবতি, চরৈবতি। দেশের সুরের সঙ্গে জীবনের সুরের এক অদ্ভুত মিল ঘটে গেল বসন্তোৎসবে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে! বিরাট রাত্রির গর্তের মধ্যে এক ভাবী যুগের ভ্রূণ যে অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে কৃষ্ণ সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল তাকে। মুগ্ধ কণ্ঠে

রাধাকে বলল: তোমাব মতই যেন বৃন্দাবনের মানুষ আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে, তা যেন ভাববার, প্রশ্ন করার অবসর নেই। সামনের অন্ধকার, পথের বাধা তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলাব জন্য প্রস্তুত। বৃন্দাবন যেন অভিসারিকা রাধা! কি ভাল যে লাগছে!

রাধা গাঢ় স্বরে বলল: একটি দীপও নেই তাদের হাতে। দীপ জ্বেলে নেবার সবুর সয়নি তাদের। এ তোমার বাঁশীব সুরের অভিসার।

বিশাখা রাধাকৃষ্ণের খুব কাছে কাছে ছিল। কথাটা শুধু নিয়েই হাসি হাসি মুখ করে বলল তোমাদের যুগল রূপ দেখতেই এসেছে লোক। তোমাদের দেখে তাদের নয়ন জুড়িয়েছে, মন মজেছে। তারা যেন কল্পনায় পৌঁছে গেছে সব পেয়েছির দেশে। এখন তার তাদেব কুলের ভয় নেই। চোখ বুজলে তারা বৃন্দাবন দেখছে।

কৃষ্ণের অধরে বাঁকা হাসি। বলল: কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করলে কংসের কারাগার দেখি। কারাগাবের বন্ধ দরজায় মাথা খুঁটছে আমার সর্বরিক্তা জননী। আমি কি সুস্থ থাকতে পারি? বুকের ভেতর আমার অশান্ত সমুদ্র। সেখানে শুধুই ঢেউ। ঢেউয়ের ফণায় দুলছে আমার স্বপ্ন, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা আর সার্থকতা।

রাধার প্রতিমার মত সুডৌল মুখে কেমন শান্ত আর স্নিগ্ধ। জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা। কৃষ্ণের স্বপ্নালু চোখের উপর চোখ রেখে বলল: লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের মত তরুণ-তরুণীদের যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দ্যাখ ওদের প্রাণের ভয় লেখা নেই। ওরা ঝর্ণার মত উচ্ছল, বায়ুর মত চঞ্চল, জলের মত সহজ। ওদের রক্তে লেগেছে পাহাড়ী ঝর্ণার নাচের নেশা। দ্যাখ কি সুন্দর নাচের তালে তালে একে অন্যকে আবীরে রাঙিয়ে দিচ্ছে। কি দারুণ উল্লাসে ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে মেয়েরা আগুনের শিখার মত জ্বলছে। আর ছেলেগুলো তার

তাপটুকু সব নিয়ে আত্মদানের আবেগে থরথর করে কাঁপছে। সবুজ উত্তরীয় উড়িয়ে, দুবাহু তুলে চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে নাচছে। মনে হচ্ছে, ওরা দীপ্ত যৌবনের অভিষেক করছে। ওদের লক্ষ্য স্থির, আদর্শ এক। ওদের হারাবার আর খোয়াবার কোন ভয় নেই।

কৃষ্ণ বলল: উপায় এবং লক্ষ্য দুইই তাদের কাছে ঝাপ্সা। তবু তাদের পায়ে লেগেছে পথ চলার আবেগ। চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠবে এই ভরসাটুকু আজ আমার পাথেয়।

প্রিয়তম, কৃষ্ণের বাঁশীতে যদি তাদের সর্বনাশও হয়, যদি কিছু অবশিষ্ট নাও থাকে তাদের, তবু চিত্তে কোন ভাবনা নেই, ভয় নেই। তোমার মোহন বাঁশীর সুরে তাদের সব ভয়, সংশয় জড়তা হারিয়ে গেছে। বৃন্দাবনের প্রতিটি নরনারী মিশে গেছে তার পরিপূর্ণ মানুষী সত্তার সঙ্গে। এখন তাদের কোথায় ভাল, কোথায় মন্দ, আর কোথায় জয়, কোথায় দুঃখ, আর কোথায় কান্না দেখার মত মন নেই। উৎসাহের দীপ্তিতে তার বুকের ভিতরটা জ্বলজ্বল করছে।

কৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল: রাধা, তুমি ঠিক বলেছ। নারী-পুরুষ একটি মানুষের দুটি সত্তা। দুয়ের মিলনে মহাশক্তির জাগরণ হয়। আজ যখন আনন্দধারা বহিছে ভুবনে তখন আর মানুষের ভেতর কোন বিকৃতি নেই, তারা কত প্রকৃতিস্থ, কত সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক, স্বাধীন। প্রতিটি মানুষের ভেতর যতক্ষণ না এই সুস্থ শক্তি বিকাশ হচ্ছে যতক্ষণ সে মনেতে, বিশ্বাসে, মেলামেশাতে সহজ না হয়ে উঠছে ততক্ষণ আনন্দধারা বহে না ভুবনে। আনন্দ না থাকলে সুস্থ, সবল হওয়া বড় কঠিন। আজ সেই কঠিন কাজটা এত সহজে চুকেবুকে যাবে ভাবতে পেরেছিলাম কি রাধা?

অভিভূত গলায় আচ্ছন্ন স্বরে বলল: প্রিয়তম, তোমার জয়যাত্রা সূচনা হয়েছে। তোমার মন্ত্রশক্তির কি তেজ! ভাবলে

বিস্ময় জাগে। প্রতিটি মানুষের চোখের তারায় যে আনন্দ ঠিকরে বেরোচ্ছে, সে শুধু প্রাণের লাবণ্য নয়, হৃদয়ের আগুন। এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে কার সাধ্য? এখন যারা আসেনি, তারাও একে একে আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে একদিন এদেশে দেওয়ালী উৎসব লাগবে। সেদিনেরও খুব বেশী দেরী নেই।

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর আপ্লুত হল। বলল: প্রিয়তমা এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই তোমাকে চেয়েছিলাম। তুমি যদি এগিয়ে না আসতে তাহলে কোথায় পেতাম এই সাফল্যের গৌরব। তোমার ভেতরই নিদ্রিত মহামায়ার মহাশক্তি। তুমি আমার ভেতর দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছ। তোমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়া পাওয়ার আগে আমার ভাবনার আকাশে এত তারা ছিল না।

রাধার দুই চোখ উজ্জ্বল আনন্দে ঝকঝক করতে লাগল। সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানা আগুনভরা রাঙা মেঘের মত রাধা কৃষ্ণেব পাশে হাসি হাসি মুখ করে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। ভারী অপরূপ লাগছিল তাদের যুগলরূপ। কৃষ্ণের বাম হাত রাধার কটিতে। সে হাত রাধা সরিয়ে দিল না। থরথর করে কেঁপে উঠল কৃষ্ণের বাহুবন্ধনে। রাধার স্নিগ্ধ শান্ত দুই চোখের উপর চোখ রেখে কৃষ্ণ বলল: রাই, আমরা দুজনে সহযোগী মাত্র। আমাদের লক্ষ্য এক। এই যুগলরূপেই আমাদের পরিচয় শাশ্বত।

রাধা মধুর কণ্ঠে আচ্ছন্ন স্বরে বলল: প্রভু আমার, স্বামী আমার, তুমি কি সুন্দর!

বসন্তোৎসব শেষ হল। আবীরে আবীরে রাঙা হয়ে গেছে বৃন্দাবন। বাতাসে আবীর উড়ছে তার গন্ধ ভাসছে। পথ জনাকীর্ণ। রাধা সবার সঙ্গে আবীর মাখতে মাখতে ঘরে ফিরল। মাথা, মুখ, শরীর তার আবীরে আবীরে লাল। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলজ্বল করছে।

আঙিনায় পা রাখতে কুটিলা পথ আগলে দাঁড়াল। গলার

স্বরে তার ক্রোধ ও জ্বালা ফুটে বেরোল। ঝংকার দিয়ে বলল: ঘরে ঢুকবার আগে দাঁড়িয়ে যাও। জলজ্যান্ত স্বামী থাকতে একটা ফুচকে ছোঁড়াকে প্রভু আমার, স্বামী আমার বলতে তোমার লজ্জা করল না?

মরালের মত গ্রীবা উঁচিয়ে রাধা গম্ভীর গলায় বলল: আর কিছু বলার আছে?

কুটিলার পাশে আয়ান ছিল দাঁড়িয়ে। কাঁদ কাঁদ গলায় কুটিলা ভাইকে শুনিয়ে বলল: শুনলে? কুলটা বৌয়ের কথা! দুধ কলা দিয়ে ঘরে কাল সাপ পুষেছ। এখন তোমার কপালে অনেক দুঃখ আর দুর্নাম আছে।

আয়ানের মুখে স্নিগ্ধ হাসি জ্বলজ্বল করছে। কুটিলাকে মৃদু স্বরে বলল: এতদিন শুধু তোদের ভয়ে আর পাহারায় মনের কথাটা ও ভাল করে বলতে পারেনি বলেই তো কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসেছিল। এতদিন পর বড় সুখে আর আনন্দে কথাগুলো বলতে পেরেছে। ওর কথাগুলো শুনে মনে হল হৃদয়ে আমার সুখের আর প্রত্যাশার নববর্ষা নেমেছে যেন। তোর কথা শুনে যদি আমার অন্তরের কান্না থামাতে চাই, তাহলে এই জগতে আমার দরকার ছিল কি? ওরে আমরা সবাই পূজার ফুল।

চমকানো বিস্ময়ে কুটিলা ডাকল: দাদা! তুমি চিরদিন সহজ আর সবল থেকে গেলে! বৌ-মনি তোমাকে জাদু করেছে। তার সব দোষ, পাপ তুমি কথা দিয়ে ঢেকে দাও। কাপুরুষের মত এইভাবে নিজের অধিকার ছেড়ে দেবে কেন?

আয়ানের চোখেমুখে হাসি উপছে পড়ল। হেসে হেসে বলল: ধরিত্রীও মাটির অভ্যন্তরে ঢোকার দরজা বন্ধ রাখেনি। যদি রাখত, তাহলে মাটির তলায় লুকোনো সোনার ভান্ডার, হীরের ভান্ডার থেকে আমরা তাল তাল সোনা আর হীরে আনতে পারতাম না! মণিকারের হাতেই স্বর্ণ অলঙ্কার হয়, হীরে দ্যুতিমান হয়। কৃষ্ণ রাধাকে শুধু সুন্দর করেছে। নইলে চিরদুঃখের কারাগারে তাকে বন্দী থাকতে হত! দস্যুর মত

সারাজীবন তাকে কাঁদিয়ে নিজেকে ধন্য করার ভেতর কোন পৌরুষ কিংবা পুরুষের মহত্ব নেই। রাধা মনেপ্রাণে আমার। সে আমার অন্তরের। তাকে আমাব হারানোর ভয় নেই! আমার সবকিছুই রাধাময়।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাধার গোল মুখখানা। নিজের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে আয়ানের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ অভিভূত গলায় অস্ফুট উচ্চারণ করল: তুমি আমার জীবন্ত ঈশ্বর। আমার বুকের ভেতর যে প্রদীপ তুমি জ্বেলেছ তা আমার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করেছে, নির্মল করেছে। বলতে বলতে চোখ ফেটে রাধার জল এসে পড়ল। মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরণা। হাসিতে, চোখের জলে তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল।



বাধা বুকেব ভেতর উথলে উঠা সমুদ্রকে যেন শাসন করতে পারছে না। উত্তুঙ্গস্রোত মুহুর্মুহু প্লাবিত কবে যাচ্ছে তাকে। একটা ভীষণ শারীরিক কষ্ট আর একটানা মানসিক যন্ত্রণা তার শবীরেব ভেতর টাটাচ্ছে। যন্ত্রণায় নুয়ে পড়ছে শবীব। শবীরের কোষে কোষে বিরহের যে সুতীব্র দাহ আর জ্বালাকে সে ভুলেছিল পনেরো বছর ধরে সে যেন অন্য এক নতুন অনুভূতিতে জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। অভিমানে তার ভাটির টান লাগল। কৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য অন্তর আকুল হল। কতকাল কৃষ্ণকে দেখে না। মানুষটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি রাধা বুকের মধ্যে এই মুহূর্তে টের পেল। বহুকাল পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এসেছে।

সকলের ভিতরেই সে শূণ্যতা। তবু সামনে পেলে রাধা শুধু একবার জিগ্যেস করবে কেমন আছে? সে বলবে ভাল। রাধা শুধু তার মুখের ভঙ্গী লক্ষ্য করবে, চোখের দৃষ্টি পরখ করবে। পরক্ষণে বিমর্ষ ভাবনা গ্রাস কবল তাকে। নিজেকে তার প্রশ্ন, কৃষ্ণ কি দিয়েছে তাকে? দুঃখ আর কষ্ট ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই দেয়নি জীবনে। তবু কৃষ্ণের চিন্তা ঘুচল তো নয়ই, বরং তার অতি স্পর্শকাতর মনটি কৃষ্ণের কথা ভেবে সবচেয়ে বেশী কষ্ট। সে কথা রাধা পাঁচজনকে বলতেও পারে না। একা একা অন্ধকূপের ভেতর তলিয়ে গিয়ে নিজেকে দেখে। তখন পৃথিবীর আর কোন আত্মজন বা সুহৃদকে নয়, কৃষ্ণকেই মনে পড়ে তার। তবে মাঝে মাঝে কোন হৃদয়-বেদনার কথা রাধা বলে শুধু আয়ানকেই। আয়ানকে কোনদিনই ফাঁকি দিতে পারিনি রাধা। যে এত ভালবাসে তাকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়?

চারদিকে ছোট মনের, ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে মনটা, শরীরটা যখন সত্যিই ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন আচমকা হাওয়ায় ভেসে আসা বাঁশীর সুর বনফুলের মিষ্টি গন্ধের মত ছড়িয়ে যায় তার সমস্ত চেতনায়। আর তাতেই তার অনুভূতিটা অন্যরকম হয়ে যায়। পনেরো বছর আগের স্মৃতি মনেব ভিতর ঘুরতেই লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে—যার নাম হাহাকার।

বৃন্দাবনে আচমকা মথুরা থেকে কংসের একজন বিশেষ দূত হয়ে অক্রুর এল যেদিন রাধার জীবনে কেন, যশোদা, নন্দের জীবনেও সেটা একটা বিশেষ দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে সে ঘটনায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বারান্দায় বসেছিল বাধা। আয়ানও ছিল তার পাশে। কেউ কথা বলছিল না। উৎসুক চোখ মেলে নিঃশব্দে কল্লোলিত যমুনার দিকে তাকিয়ে তার ঢেউ দেখছিল। এথান থেকে যমুনার তীর, গাছপালা সমেত নন্দ ঘোষের বাড়ীর অনেকটা দেখা যায়। বিশেষ করে কারা এল, আর কারা গেল তা সবটাই

নজরে পড়ে। উৎসুক চোখে উভয়েই সেদিকে নিঃশব্দে চেয়েছিল।

দ্বিপ্রহর।

অকস্মাৎ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বখুরধ্বনি দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করল। সুদৃশ্য একটি রাজকীয় রথ এসে থামল নন্দের গৃহের অঙ্গনে।

আচমকা রথের আগমনে নন্দ একটু বিচলিত ও বিব্রত বোধ করল। অতিথিকে কিভাবে আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা করলে সব কুল রক্ষা পায় তার একটা বিপন্নভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

রথ থেকে যে নামল তার লম্বাটে মুখে কটা চোখে হাসি হাসি সরলতা। বেশ একটা উচ্ছ্বাসভাব। হাসির ভিতর উদ্দাম প্রাণের ইশারা।

কিন্তু তারই পাশাপাশি আর একখানা মুখ উঁকি দিল রাধার মনের ভিতর। সে মুখ নন্দের। ভাবলেশহীন নির্বিকার পাথরের মূর্তির মত। তার দুচোখে বিষাদের ছায়া। কিছু যেন হারানোর ভয়ে শঙ্কিত।

পনেরোটা বছর কেটে গেছে তবু চোখের উপর সেই দৃশ্যগুলি ঠিক আগের মতনই দেখতে পাচ্ছিল। নিজের অজ্ঞাতে, অজান্তে রাধা উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে নিজের মনেই শব্দ করে বলল: এই রে, অক্রুর এসেছে। হাবভাব দেখে বোধ হচ্ছে, কংসের দূত হয়ে এসেছে।

আয়ান বিস্ময়ে চমকে উঠেছিল। বলল: কেন? সে এল কেন? ব্যাপার কি? চল তো দেখে আসি।

বাতাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বৃন্দাবন ভেঙে লোক এল নন্দের গৃহে।

যশোদা মূর্ছিতা।

নন্দ পাষাণমূর্তির মত স্তব্ধ নির্বিকার। সে কথা বলছে না, কাঁদছে না। থেকে থেকে বুকের হাহাকার; চাপা দীর্ঘশ্বাসের

মত পড়ছিল।

জনতা হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা আর দুঃখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। তারাও বাক্যহারা। চোখে তাদের জল বাধা মানছে না। প্রাণের কৃষ্ণকে মথুরার দুশমন কংসের কাছে কোন্ প্রাণে পাঠাবে?

ভীড়ের মধ্যে রাধা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত। ঊর্ধ্বমুখে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কান্ড সে নির্বিকার। তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভয়ও নেই। আনন্দে খুশিতে তার দুচোখের মণি চক্‌চক্ করছে। অক্রুরের দুই হাত ধরে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল: এত বড় ধনুর্যজ্ঞে দেশের রাজা তাকে আমন্ত্রণ করেছে, তাঁর নিমন্ত্রণ কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারে সে? তাতে রাজার আশাভঙ্গ হবে যে! সামান্য প্রজার এত বড় স্পর্ধাও রাজা সইবে না। আবার ভীরু কাপুরুষের কলঙ্ক অগৌরবও বহন করতে পারবে না।

যশোদা মূর্ছা থেকে উঠে বসল। স্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠল সে। কাঁধ থেকে তার আঁচল খসে পড়েছে। দেহভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে যেন। বেশবাস, কেশ তার আলুথালু হয়ে গেছে। যশোদার অসামান্য মুখশ্রীতে যে কষ্টের ছাপ ও মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা ফুটে উঠেছিল তার দিকে চেয়ে শিথিল হয়ে গেল কৃষ্ণ। তাড়াতাড়ি সে যশোদাকে ধরল। অস্পষ্ট আধো চেতনার মধ্যে যশোদা কৃষ্ণের প্রশস্ত বুকের উপর মাথা রাখল; একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল যশোদার। তারপর খুব ক্লান্ত, অবসন্ন গলায় নিরীহভাবে জিগ্যেস করল: হাঁরে, কানু তুই আমায় ছেড়ে যাবি?

কৃষ্ণ খুব একটু মলিন হেসে অসহায় গলায় ডাকল: মা! সমবেত জনতার প্রত্যেকের দৃষ্টি যশোদা ও কৃষ্ণের উপর স্থির।

যশোদা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীচু ও অদ্ভুত করুণ গলায় ডাকল: কানু, তুই গেলে বাবা, আমি বাঁচব না। এই বৃন্দাবনের যেদিকে তাকাব সেদিকেই দেখব আমার কানু নেই।

আকাশ, বাতাস, বন-উপবন, নদী প্রান্তর কেঁদে কেঁদে বলবে কানু নেই, কানু নেই। ধেনুরা হাম্বা হাম্বা করে বলবে, কোথা গেলে কানু পাই। চোখের দেখা দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা নিয়ে বাঁচা যায়?

আঁখি গেলে তার কি ছায় জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।

কৃষ্ণের চোখে এক গভীর বিষণ্ণতা নেমে এসেছিল। চমকেও উঠেছিল যেন একটু। চোখের জল মুছে যশোদা নিঃশব্দে অভ্যাসবশে তার শাড়ীটাকে গুছিয়ে নিল। বেদনা-বিধুর দুচোখ ভরে তার জল টলমল করছিল।

কৃষ্ণ নীবব। ভাবী অস্বস্তি বোধ করছিল। যশোদা তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল: অক্রুর যেন ঝঞ্ঝার মত এসে আমার ঘবেব সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিল। কি এমন বলল, যে মা-ব ক্লেশ বেদনাও তোর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

চমকানো বিস্ময়ে কৃষ্ণ অসহায় গলায় ডাকল: মা! প্রতিদিন আমি প্রত্যূষে প্রথম সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতাম— হে শাশ্বত ঈশ্বর, আর কতকাল আমি প্রতীক্ষা কবব? কবে মথুবাধিপতি কংসের ডাক এসে পৌঁছবে আমার? মা, মাগো আজ আমার জীবনে সেই সূর্যোদয় হয়েছে। আমার দেহ-মন জুড়ে বাজছে সুরের ঝঙ্কার। কি এক স্বর্গীয় সুখ আব তৃপ্তিব মধ্যে আমার চেতনা ডুবে আছে। মনে হচ্ছে, তোমার এই অশ্রুমাখা চোখের ভিতর আমার দুঃখিনী জন্মদাত্রীকে দেখছি। কংসেব কারাগারে বন্দী মা আমার জন্মভূমি। তোমার ভেতর দিয়ে চিনেছি মানুষকে, দেশকে, আমার ইষ্টকে। তুমি আমাব ধাত্রীদেবতা।

যশোদার গলা ভারী শোনাল। বলল: কৃষ্ণ, মায়ের মন বড় অবুঝ আব অশান্ত। আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারছি না! কত কু কথা মনের ভেতর ঝড় তুলছে। ঝড় প্রলয় না ঘটিয়ে থামবে না!

কৃষ্ণ কেমন উদাস অন্যমনস্কতার ভেতর ডুবে গিয়ে আচ্ছন্ন স্বরে বলল:

কতো দীর্ঘদিন আমি এমন প্রবাসী হয়ে আছি।
বড় দীর্ঘদিন, দীর্ঘবেলা।

কৃষ্ণ হাসল। তার হাসিটা আশ্চর্য। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের হাসির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। মৃদুস্বরে যশোদাকে সমবেদনা জানানোর জন্য বলল: মা, মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই এত দুঃখ আর যন্ত্রণা। দুঃখ-বোধ যার নেই সে তো মানুষ নয়। মানুষকে দুঃখ উপলব্ধি করবার মত শক্তি ও বুদ্ধি যেমন বিধাতা দিয়েছে, তেমনি সে দুঃখ-যন্ত্রণা উত্তরণের শক্তি ও তেজও আছে তার সত্তার মধ্যে নিহিত। মনকে অশুভ করা যেমন সহজ, তেমনি তাঁকে শান্ত রাখাও কোন কঠিন কিছু নয়। দুঃখের সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়ার আর এক নাম তো জীবন। তাকে বা তার স্বরূপকে আমাদের অনেকের বোঝার ক্ষমতা হয় না বলেই হয় তো বলি ঈশ্বর নিষ্ঠুর।

যশোদা হতভম্ব। কেমন জমাট শক্ত, বরফের মত এক শীতলতায় সে কেমন অবশ হয়ে গেছে। চোখের মণিতে উদাস অন্যমনস্কতা নিয়ে সে চেয়ে থাকে কৃষ্ণের মুখের দিকে। মুখে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা। চোখের নীচে কাজলের মত কালিমা।

গহন বিষণ্ণতার মধ্যেও সত্যিকারের একটু আনন্দ অস্ফুট হয়ে ফুটল কৃষ্ণের মুখে। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন বিগলিত গলায় বলল: তুমি আমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দাও।

যশোদা কোন জবাব না দিয়ে অশ্রুভরা চোখে ম্লান হাসল। লুব্ধ মন এই আমন্ত্রণের ভালমন্দ বিচার করল না। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উজ্জীবক স্পর্শ তার চোখমুখকে উজ্জ্বল করে দিল।

রাধার বুকের ধকধকানিটা শুরু হল এ সময়ে। কারণ রাধা জানে যশোদার স্নেহ-কাঙাল মন বরাবরই এরকম ভালবাসা চায়। যাওয়ার সময় কৃষ্ণ তাকে ইশারা করতে ভুল করেনি।

রাধাও অনেকক্ষণ ধরে মনে প্রত্যাশা করছিল, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই নিভৃতে তাকে ডাকবে। তাকে বলবে কিছু। সেই চরম কথাটা কি তাও সে আন্দাজ করতে পারে। তথাপি কৃষ্ণের চোখের ঈশারায় এমন এক বিদ্যুৎ ছিল যে একই সঙ্গে বুকের মধ্যে তীব্র চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল তার।

পনেরো বছর পরেও সেদিনের সেই ক্ষণটাকে ভাবতে, মনের ভেতর রোমন্থন করতে কী আশ্চর্য সুখে, আনন্দে তার দেহ-মন ভরে গেল। অনুভূতিতে তার সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা নেই। তার অসীম ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়ে সে ক্ষণকালিক উপস্থিতিকে অতিক্রম করে গেল।

'ক্ষমা কর', বলে কৃষ্ণ হঠাৎ তার ডান হাতখানা ধরে করপল্লব চুম্বন করল। রাধা অবাক হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চিত্রার্পিতের মত সে তার খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার একটুও সরে যেতে ইচ্ছে করল না। কৃষ্ণের দু হাতের মুঠোয় তার হাতখানা ধরল। রাধার ইচ্ছে করছিল না ছাড়িয়ে নিতে। অনন্ত সময় বয়ে গেল। তবু, ঐ ধরা অবস্থায় রইল। কৃষ্ণের ঐ সুন্দর মধুর স্পর্শে তার সারা শরীরের মধ্যে তখন ঘুঙুর বাজছিল। কৃষ্ণ তার হাতখানা নিজের গালে ছোঁয়াল। রাধার শরীরের কোষে কোষে এক অস্থির যাতনা ছড়িয়ে পড়ল। যদিও, কৃষ্ণ এবং রাধার অবস্থানের মধ্যে একটা ব্যবধান বরাবরই ছিল। তবু সে রাধাকে একটুও কাছে টেনে নিল না। রাধার হৃদয় নুয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিল।

অনেকক্ষণ তারা দুজনে চুপ করে ছিল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাধা আকুল স্বরে প্রশ্ন করল. কৃষ্ণ, তোমার হাতে হাত রাখলে এমন ভাল লাগে কেন?

কি জানি? মানুষের মনের অনেক কিছুই হয়ত হাতের ছোঁয়ায় থাকে। তাই বোধহয় হাতের পরশেই সমস্ত শরীর গলে যেতে চায়।

রাধার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। কৃষ্ণের উত্তর তাকে

খুশী করল, কিন্তু তার বাড়াবাড়িতে লজ্জিত হয়েছিল অনেকখানি।

কৃষ্ণ চুপ করে রাধাব দু চোখের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না। এটা কৃষ্ণের অনেক পুবনো খেলা। রাধার চোখের মধ্যে চোখের দৃষ্টি এমন করে ফেলে কৃষ্ণ যেন একটুও উপছে পড়ে নষ্ট না হয়। রাধা কৃষ্ণের এই চাউনি চেনে।

কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে রাধা বলল: হয়েছে এবার ফেরাও তোমাব চোখ। যাওয়ার সময় অমন করে তাকিয়ে আর দাগা দিও না।

কৃষ্ণ কথা বলল না। রাধার ডানপাশে এসে দাঁড়াল। ওর হাত ধরল। নিজের হাতের ওপর বাখল। তারপর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস ফুটে ওঠল। স্নিগ্ধ গলায বলল: চোখটা বন্ধ করে হাতের পাতা খোল। আমার হাতের ওপর মেলে দাও।

রাধা কৃষ্ণের কথায় তাব ডান হাতেব পাতাটি মেলে দিল। দুপুরবেলায় স্থলপদ্মের মত দেখতে লাগল সে কর পদ্ম। আঙুলে আঙুলে পাতায় পাতায় উষ্ণতার মিলন হল। রাধার সারা শরীর চিনচিন করে ওঠল। বলল: চোখ খোল এবার।

রাধা চোখ মেলে দেখল, কৃষ্ণের বাঁশী তার হাতে। মুখে বিস্মিত হাসি। চোখে অবাক মুগ্ধতা। বাঁশীটি পরম আদরে গালে ঠেকাতে তার চোখ জলে ভরে গেল। কতবার তার ওপর চুম্বন এঁকে দিল। ছিদ্রের ওপব বার বার মুখ রাখল।

অনেকক্ষণ পব কৃষ্ণ মৃদু গলায বলল· বাঁশীটা এখন থেকে তোমার কাছেই থাক।

রাধা চমকানো বিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ বলল: না, এ বাঁশী বহনের শক্তি আমার কোথায়? শুধু তুমি আরও একটু ধরে থাকতে দাও। কতদিন নিজের হাতে ধরে এমন আদর করিনি। এমন করে হাতেও পায়নি কখনো। আজ আমার মনপ্রাণ ভরে গেল এক অনির্বচনীয় সুখে।

যে বাঁশী নিয়ে তোমার এত আনন্দ, সে বাঁশী তোমাব

হোক।

সত্যি বলছ! দেবে!

কৃষ্ণ মাথা নাড়ল।

রাধার চোখেমুখে উৎফুল্ল ভাব, বলল: সত্যি? কি যে তুমি আমার মত একজন সাধারণ মেয়ের মধ্যে দেখেছিলে জানি না। তোমার সবচেয়ে প্রিয় বাঁশীটি দিয়ে আমাকেই তুমি ধন্য করলে। তোমার ভালবাসার প্রেম আমাকে গৌরবান্বিত করল। আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু বাঁশী হারিয়ে তুমি যে রিক্ত হয়ে যাবে, এত আমি চোখ থাকতে প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। বাঁশী কৃষ্ণের অলংকার। বাঁশী ছাড়া কৃষ্ণকে কে কবে ভেবেছে? কৃষ্ণেব প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যে বাঁশী, তাকে কেমনে নেব গো আমি?

ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় কৃষ্ণ। বুকের ভেতর তার অদৃশ্য বাঁশীর সুর বাজতে লাগল। তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে এল সুনিবিড় প্রেমের ছায়া। গদগদ স্বরে বলল: রাধা ছাড়া কৃষ্ণের কি আছে পরিচয়? রাধা মানে অনন্ত প্রেম। যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ সেখানেই অমর প্রেম। তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ মধুরিমায় ভরে আছে এ অন্তর। তাই কিছু হারানোর ভয় নেই আমার।

রাধার উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণতারা দুটো যেন ঝিক্ করে হেসে উঠল। উল্লাসের কলধ্বনি বাজছিল রাধার বুকের রক্তে। বিপুল এক সুখের ভিতরে এক অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছে কৃষ্ণের আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখ। উৎকণ্ঠায় সহসা তার বুক টন্‌টন্ করে ওঠল। বলল: বাঁশী না থাকলে আমার বংশীধারী কৃষ্ণকে চিনব কি করে? কৃষ্ণ ছাড়া কার ললিত অঙ্গুলি বিন্যাসে বাঁশীর সুর এমন সুদূর লোকান্তপারের সঙ্গীত হয়ে উঠবে? আমার সাধ্য কি তোমার সুরের মুগ্ধতা সৃষ্টি করি বাঁশরীতে? কাজ নেই, তোমার ঐ বেণুতে! ও তোমারই থাক।

বিস্ময়ে ছট্‌ফট্ করে উঠল কৃষ্ণের দুই চোখ। কয়েক মুহূর্ত

মাত্র। তারপর কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাল। বলল: তাহলে, এবার বিদায় দাও সখী।

তার ছেঁড়া বীণার মত নিদারুণ বেদনায় রাধার ভেতরটা ঝংকারে বেজে ওঠল যেন। কণ্ঠে তাব হাহাকার ছাপিয়ে ওঠল। বলল: সে কি? তুমি বলছ কি কৃষ্ণ? বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে কেন? কোন্ দোষে, অপরাধে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ প্রিয়তম? তোমার বিহনে রাধার কি হবে ভেবেছ? তুমি গেলে বৃন্দাবনের আর থাকল কি? কোন্ মোহে এখানে থাকব?

জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় মোচড় দিল রাধার। কৃষ্ণের চোখে পলক পড়ে না। তার ঘন আয়ত কালো দুই চোখের তারা নিশ্চল বেদনায় থমথম করতে লাগল। কৃষ্ণের সমস্ত চেতনার ওপর নেমে এল বিহ্বলতা। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল সে। শরীরের ভেতর একটা আকুলকরা অস্থিরতা টন্‌টন্ করছিল! একটা নিবিড় যাতনা মেশানোর আবেগে তার বুক ফুলে উঠল।

বাইরে রাধাচূড়ার স্তবক, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, পাতায় পাতায় ঝড়ের বিলাপ। ডালে ডালে কাঁপুনি। ঘন কদম গাছের পাতা যেন শ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাধার মুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন। উদগত নিঃশ্বাস যেন তার বুকের খাঁচায় কদমের মত আটকে আছে। কান্না গিলে গিলে বলল: কৃষ্ণ, মথুরা তোমার স্বপ্নময় পৃথিবী। তোমার স্বপ্নের জগতে তোমার নিমন্ত্রণ আজ। কিন্তু বৃন্দাবন তোমার কৈশোর, যৌবনের লীলাভূমি, গোকুল তোমার শৈশব বাল্যের ক্রীড়াঙ্গন— এদের ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

একটা কষ্টে কৃষ্ণের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। কষ্টে বলল: রাই, অমন করে আমাকে দুর্বল করে দিও না। মথুরা সম্পর্কে তোমাদের সকলেব আশঙ্কা, উদ্বেগ, অস্থিরতা কেন? মথুরায় কী আমি নির্বাসন যাচ্ছি? মথুরা থেকে আমি ফিরব না, এ অমঙ্গল চিন্তায় তোমরা স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছ। তোমরা

সকলে অবুঝ আর উতলা হলে আমিই যে দুর্বল হয়ে পড়ব। অথচ, তুমি জান মথুরায় যাওয়া কত দরকার। বিধাতার অমোঘ নিয়মে আমাকে মথুরায় যেতে হচ্ছে। এজন্য বিলাপ করবে কেন? হর্ষ কর, শঙ্খ বাজাও।

ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার ভেতর থমথমে গলায় বলল: প্রিয়তম, কংস ভাল লোক নয়। তাই, তোমাকে ছেড়ে দিতে বড় ভয় করে। মেয়েমানুষের মায়া আর ভয় জন্মগত অভিশাপ।

কৃষ্ণ হাসল। রাধার জন্য তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা অসহনীয় দুঃখবোধ নিবিড় বেদনায় মিশে ছিল। তবু কথা বলার সময় তার কালো দুই চোখের কোণে কেমন একটু নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরোল। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও ভারী লাগল। বলল: শুধু অন্ধ মমতা, মোহ আর স্বার্থপর প্রেম নিয়ে অনন্তকালের গতিকে ধরতে চেও না। কাল নিরবধি। বিধাতাও নিষ্ঠুর। জীবন থেমে নেই। পৃথিবীও চলেছে। চলাটাই পরম গতি। তোমার আমার সাধ্য নেই তাকে ধরে রাখি। খড়কুটোর মত সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্যই আমরা জন্মেছি। শুধু সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ কর। তিনি তোমার নিয়ন্ত্রা। তুমি নিমিত্ত।

রাধা সম্মোহিত। স্তব্ধ। বাক্যহারা। কষ্টে বুকের ভেতর টন্‌টন্ করছিল। তার দুই চোখের তারা কৃষ্ণের চোখে নিশ্চল। কিন্তু সে কিছুই দেখছিল না। বুকের ভেতর তার মহাপ্রলয়ের কলরোল বাজছিল। চোখের তারায় অন্তর্ভেদী নীরবতা। ঠোঁটে ঝড়ের কম্পন যা ভেতর থেকে উৎসারিত; দমনে অসহায় এবং দুরন্ত। আনন্দে তার হৃদয় মথিত ও ব্যথিত হতে থাকে। তবু দৃষ্টির রূপ বদলায়। কান্নার আবেগে থর থর করে ঠোঁট কাঁপে। চোখে জল ছলছল করে। নিজের মনের যন্ত্রণায় বুঁদ হয়ে গেল রাধা।

অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। আর সে

শ্বাসের সঙ্গে গভীর বেদনায় বেরিয়ে এল রাধার স্বর : বড় কষ্ট ভালবাসায়।

কৃষ্ণ মাথা নাড়ল। বলল: তোমার ভিতরে বড় অস্থিরতা।

ঝাপ্‌সা চোখে রাধা বলল: ঠিকই তো, ভীষণ অস্থিরতা। মনে হচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাব।

কৃষ্ণ একটু থমকাল। ভিতরটা তার ধীরে ধীবে আরো কঠিন হল। বলল: রাই! আমার মন্ত্র হল; প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে এই মন্ত্র কিন্তু, তোমার জপতপ হয়নি। অথচ তোমার কাছেই ছিল বেশী প্রত্যাশা।

ওগো প্রিয়, মানলেও হৃদয় দিয়ে মানতে পারছি না, হৃদয় আমার ছিঁড়ে যাচ্ছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

কেন এমন হল?

নিষ্ঠুর হতে পারছি না তাই।

যে প্রেম শুধু কাছে টানে, স্বার্থপরের মত আঁকড়ে থাকে, ধরে রাখে সেই ছোট্ট সঙ্কীর্ণ ভালবাসা তো আমি চাইনি। মানুষের যে প্রেমে ত্যাগের আলো এসে পড়ে সেই মহান প্রেম ত্যাগে কাতর হয় না, দুঃখে বিচলিত হয় না; আমি তোমার মধ্যে তার জ্যোতির্ময় সত্তা দেখেছি। রাই, আমার সে দেখার মধ্যে কী ভুল ছিল? মিথ্যে ছিল?

রাধা সচকিত হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের ভাবটা বুঝে নেয়। তারপর, দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদল। আস্তে আস্তে তার ভিতরটা কঠিন হল। দানা বেঁধে ওঠল দুঃখ প্রতিরোধ। মৃদু কণ্ঠে বলল: ওগো আমার নিষ্ঠুর; আমার প্রিয়, তোমাকে আর মায়া দিয়ে বাঁধব না। ধরেও রাখব না। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত তুমি মথুরার নীল আকাশের জন্য ছটফট করছ। তুমি যাও। রাই, তার প্রেমের দীপ জ্বালিয়ে তোমার অপেক্ষায় দিন গুনবে। তুমি এস; সত্যিই এস। অন্তত তোমার রাইয়ের জন্য একবার এস।



তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে রাধা নিষ্পলক চেয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। বাঁশীর সুর থেমে গেছে। ভোরের মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে মুখমন্ডলে। পনেরো বছর পর এই প্রথম তার বুকের মধ্যে কিসের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল। দুই চোখ তার টনটন করে উঠল জলে। ধরা গলায় বলল: আমি তোমাকে চিনি! খুব চিনি! আমি জানতাম, কৃষ্ণ তুমি আমার জন্যে অন্তত ফিরে আসবে। তোমাকে ভালবাসি বলেই ঠেকাতে পারনি আমাকে। সত্যিকারের ভালবাসার কাছে ধরা তো দিতেই হয়। কৃষ্ণ তুমি আমার মুখ রেখেছ! তুমি এসে আমার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছ।

আকাশে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। পাখীরা নীল

আকাশে ডানা মেলে দেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। দুঃসাহসী দু তিনটা পাখী ঝাপসা অন্ধকারের ভেতর আকাশে উড়ে গেল।

রাধা স্বপ্নাতুর দুই আঁখি মেলে চেয়ে থাকল ভোরের শুভ্র নির্মল আকাশের দিকে! ভোর যে হয়েছে তার খেয়াল নেই!

আয়ান চুপি চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাধা কিন্তু তার আগমন টের পেল না। বুকের ভেতর থেকে একটা গভীর শ্বাস পড়ল। দরদ ও সহানুভূতিতে আয়ানের বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠল।

মৃদুস্বরে বলল: খুব খারাপ লাগছে, তোমার, না? সারাটা রাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেত? আমাকে ডাকলে না কেন? এত কষ্ট পাবার তো কোন দরকার ছিল না। এখন তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তা কি তুমি বোঝ না।

রাধা অপ্রস্তুতভাবে হাসল। আয়ানের দরদ সহানুভূতির স্পর্শে তার বুকের বেদনার সমুদ্র উথলে ওঠল! কান্না কান্না গলায় বলল: সত্যি তুমি অদ্ভুত মানুষ! কত ভালবাস আমাকে। কিন্তু আমি কি দিয়েছি তোমায়? আমার আনন্দের জন্য সুখের জন্য তোমার হৃৎ-কমল ছিঁড়ে দিয়েছ। যে আমাকে সব দিল তাকে আমি কি দিলাম? তার বধূ হতে পারলাম না, তার সন্তানের মাতাও হতে পারলাম না। আমার মত দুর্ভাগা কে আছে?

অত উতলা কেন হচ্ছ? এসব প্রশ্ন করে তোমার ভালবাসাকে অপমান কর না। এক মুহূর্তের জন্য কখনও ওসব চিন্তাও করিনি আমি। এসব নিয়ে আমার কোন দুঃখ, ক্ষোভ কিংবা বঞ্চনার জ্বালা নেই। কখনও মনে হয়নি তুমি আমাকে কোন কিছুতে বঞ্চিত করেছ।

রাধা আর থাকতে পারল না। ভীষণ কষ্টে, যন্ত্রণায় আকুল হল বুক। বলল: বিশ্বাস কর আমি তোমায় ঠকায়নি।

কি পাগলামি কর, বলতো? তোমার মত কৃষ্ণপ্রেমে

আমিও পাগল। আমার পার্থিব ভোগ আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণের পায়ে সমর্পণ করতে পেরে ধন্য হয়েছি গো। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা অতুলনীয়। আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ তুমি কষ্ট পেলে। তোমার জন্যই আমার খুব খারাপ লাগছে।

আয়ান রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর রাধার বুকের যত জ্বালা আর কষ্ট তা একটু একটু করে শীতল হয়ে এল। মনে হল তার সব দুঃখের সান্ত্বনা আয়ান। আয়ানই তার মুক্তি।





উদ্ধবের ঘুম ভাঙল, দেখল রোদ এসে পড়েছে তার গায়। পাখী ডাকছে। ওদের ঝাপটানো ডানায় ছিট্‌কে পড়া পালকের গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে। কাছেই কোথাও গলায় ঘণ্টা বাঁধা গরু মাথা নাড়ছে। তার পথ চলার খুরের শব্দ মাটি থেকে উঠে আসছে। দীঘির জলে গাছের ফাঁক দিয়ে গলে পড়া সূর্যের নরম আলো দর্পণের মত টলটল করছে। কাঁপা আলোতে দীঘির জল মাছের আঁশের মত ঝলমল করছে। চোখ রগড়িয়ে একটা হাই তুলে উদ্ধব ভূমিশয্যা ছেড়ে ওঠল। দীঘির জলে মুখ ধুল, হাত-পা প্রক্ষালন করল। তারপর কি ভেবে ঠান্ডা জলে চান করে নিল। বেশ ঝরঝরে লাগল শরীর। কেমন একটা পবিত্র পবিত্রভাব লাগল। কৃষ্ণের নামে জয়ধ্বনি করে সে পথ

হাঁটা শুরু করল।

উদ্ধব গত রাত্রে মথুরা থেকে এসেছে। কৃষ্ণ তাকে সরজমিনে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের পর পনেরোটা বছর কেটে গেছে। বৃন্দাবনের সেই শ্রী আর নেই। গাছের মত এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে। গাছেরা মৌনী নির্বাক। শীতের শেষে ঝরে যাওয়া পাতার মতই তাদের দুরবস্থা। পাতায় পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস হাহাকারের মত বাজে। পত্রশূন্য গাছেরা আকাশের দিকে ডালপালা মেলে যেন বিধাতার কাছে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা করছে। বৃন্দাবনের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে উদ্ধবের এসব কথা মনে এল কেন, নিজেও জানে না। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছেটা তার মরে গেল। রাত্রিটা কৃষ্ণের প্রিয় কদম গাছের তলায় বসে কাটিয়ে দেওয়া মনস্থ করল। রাখালিয়া বাঁশী হল তার সঙ্গী।

সারারাত ধরে বাঁশী বাজাল। কদম গাছ যেন কায়াহীন কৃষ্ণ হয়ে তার বাঁশীতে এক আশ্চর্য সুর ভরে দিল। আর সে শূন্য কলসের মত বাঁশীর রাগিনীতে ভরে উঠল। তার সুরের মধ্যে ছিল অমরত্বের সংবাদ, যা প্রেমের চির অতৃপ্তি থেকে দেহহীন, স্পর্শহীন এক স্বপ্নের জগতে মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার ও রাধার। আয়ানের বাড়ীতে পা দিয়ে সে তার টের পেল।

উদ্ধবকে দেখেই রাধা দৌড়ে এল। কিছুক্ষণ সপ্রতিভ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। রাধার মনে হল সে যেন সহসা কোন দেবলোক থেকে এসেছে কৃষ্ণের আগমনের বার্তা নিয়ে। বিস্ময় এবং নিস্তব্ধতার সেই ক্ষণটুকু বোধ হয় রাধা ও উদ্ধবের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। সমস্ত সৌন্দর্যের শেষ থাকে। ফুরিয়ে যায় এক সময়। ফুরিয়ে যাওয়ার আগের এই নিঃশব্দ শব্দময়তার মধ্যে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে কাটানো'র পর প্রথমে অপ্রতিভ হয়ে তারপর সপ্রতিভ মুখে একটু হেসে প্রশ্ন করল: উদ্ধব-দা তুমি এসেছ? কতকাল পরে তোমাকে দেখলাম। সেই

যে মথুরায় গেলে, আর একটিবারও খবর দিলে না তোমরা। আমাদের কথা বেমালুম ভুলে যেতে তোমাদের কষ্ট হল না? তোমরা বড় নিষ্ঠুর। হ্যাঁ গো, তোমার বন্ধু কৃষ্ণকে তো দেখছি না? সে কোথায়?

উদ্ধব এক মুহূর্ত বোবা হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল: মথুরায়।

প্রত্যাশায় আঘাত লেগে কুঁকড়ে গেল রাধা। বুকের ভেতর তার ঝড় ওঠল। তবু শান্ত গলায় নিরাবেগ চিত্তে বলল: মথুরায়! বৃন্দাবনে আসেনি সে?

উদ্ধব কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের দোষ ঢাকতে বলল: এখানে আসতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার!

রাধা দু চোখ কপালে তুলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল: কষ্ট!

হাঁ গো। সে বলেছিল মথুরা আর বৃন্দাবনের মাঝ দিয়ে যমুনা যেন স্নেহ, মমতা, প্রেমের নদী হয়ে বয়ে গেছে। এপার আর ওপারের মানুষের ভালবাসার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস হাহাকার করে। তবু অসহায় মানুষকে নিরুপায়ভাবে মেনে নিতে হয় এই ব্যবধানকে। ঐ ফাঁকটুকু বোধ হয় কোনদিন আর ভরে ওঠবে না। এ হল প্রকৃতির বিধান।

তুমি কোন্ ফাঁকের কথা বলছ, উদ্ধবদা?

জীবনের ফাঁক। মথুরা আর বৃন্দাবনের জীবন একরকম নয়। দুটো দুরকম। এক জীবনের সঙ্গে আর এক জীবনকে মেলানো যায় না। মেলাতে গেলে তাল কেটে যাবে। বেসুর বাজবে।

রাধার বুকের ভিতর থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ওঠে এসে ধীরে ধীরে নেমে গেল। ক্লান্ত ও বিষণ্ণ গলায় বলল: অথচ কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি তার প্রতীক্ষা করছি। কতবার মনে হয়েছে দূরে কোথাও যাই। কতবার স্বামী বলেছে—চল বাইরে কোথাও যাই। কিন্তু এই বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে আমার পা উঠল

না কিছুতে! মথুরা থেকে কৃষ্ণ এসে যদি দেখে তার রাধা নেই, তাহলে সে কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। সখার কথা ভেবে যাইনি কোথাও, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। কেন এই আকাঙ্ক্ষা? ইচ্ছার এত জোর কোথা থেকে আসছে? নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে কতদিন বলেছি আমার সকল কাঁটা ধন্য হয়ে ফুটবে গো ফুল ফুটবে। কিন্তু সে যে কুসুমিত হওয়ার আগে কুঁড়ি অবস্থাতে মরে যাবে একথা স্বপ্নেও মনে হয়নি কোনদিন।

রাই তোমার দুঃখটা সত্য, কিন্তু তার দুঃখ কাতরতাতেও কোন ছলনা নেই। তার মধ্যে একরকমের চাপা কান্না আছে। এক অন্ধ ভাবাবেগের প্রবল যন্ত্রণা তার হৃৎপিন্ডকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সেটা যে তার কত বড় ক্ষত, জানলে কখনও তাকে অপরাধী করতে না। বৃন্দাবনের বাঁশী ছেড়ে মথুবাব অসি ধরেছে সে। বাঁশীর সুর গেছে হারিয়ে। তাই তো আমাদের কৃষ্ণের দুঃখ গো, বাঁশী কেন রাধা রাধা করে না উদ্ধব। এ বাঁশীর সে মিষ্টি সুর কোথায় গেল? সুরের পর্দায় কাঠামোর ওপর আস্তে আস্তে আলাপটা জমে আর গভীর হয়ে ওঠে না কেন? অথচ একদিন সুরের ভেলায় ভেসে ভেসে কোন্ স্বর্গলোকের দিকে চলে যেতাম, উদাসী বাঁশীর যে সুবে দুগ্ধফেননিভ গাভীরা পুচ্ছ উচ্ছে তুলে, শিং নাড়িয়ে, ঘাড় দুলিয়ে দৌড়োদৌড়ি করত, রাখাল বন্ধুরা হৈ-চৈ করে খেলায় মেতে উঠত, রাই ও তার সখীরা মথুরার হাটে গজেন্দ্রগমনে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াত, বিদ্যুৎকটাক্ষ হেনে দেহের কোষে কোষে যে শিহরণ জাগাত, আমার কাজ ভোলানো সেই বাঁশীর সুর কোথায় ভাসিয়ে এলাম? মথুরায় বৃন্দাবনের সব কথা ভাসিয়ে দিলাম কোন্ কূলে? নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন করে? এই হাহাকার, বিলাপ কৃষ্ণ কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বংশীধারী কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের মানুষ চেনে।

বেণু ছাড়া কানু মনিহারা ফণীর মতই বৃন্দাবনে।

রাধাব গায়ে কাঁটা দিল। ভেতরটা তার মোমের মত করুণায় দুঃখে গলে গলে পড়তে লাগল। অবাক হয়ে উদ্ধবের চোখের দিকে চেয়ে রইল। পুরুষের উপব নারীর চিবসংশয়ী মনটা এসব কথা মানতে চায় না, অথচ সন্দেহও ছাড়ে না। তবু মনে হল, উদ্ধব তার সমস্ত মনটাকে বদলে দিল। বলল· দুঃখ কি ওর একারই? দুঃখী নয় কে? তবে, একথাও ঠিক এ ধরনের দুঃখবোধ নিয়ে সংসারে সকলে জন্মায় না।

উদ্ধব উৎফুল্ল হয়ে বলল: তুমি ঠিক ধরেছ। বৃন্দাবনেব জন্য কৃষ্ণের প্রাণ কাঁদে, বুক ফাটে। কাউকে সেকথা বলতে পাবে না। কেবল আমি জানি, কি গভীর কান্না বয়ে বেড়াচ্ছে সে। বৃন্দাবনের গোপ-গোপিনীদের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না। গোকুলে নন্দ-যশোদার স্নেহ-মমতা তাদের উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ব্যাকুলতার কথা মনে হলে তাকে কেমন পাগল পাগল দেখায়। কৃষ্ণের মত এমন বিষণ্ণ মন নিয়ে যেন কেউ না জন্মায়। ওর জীবনটা বড় কষ্টেব আব দুঃখের। কৃষ্ণেব নিঃশব্দ কান্না আমি সইতে পারি না।

রাধার বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল। কান্নাটা তাব গলার কাছে কাঁটার মত বিঁধে রইল। ভেজা গলায় বলল· উদ্ধবদা, বন্ধুর দোষ ঢাকার জন্য কেন এত মিথ্যে কথার জাল বুনছ? বেশতো ভুলেই ছিলাম। নেভা প্রদীপ তুমি উস্কে দিলে কেন? এমন করে প্রাণে দাহ দিতেই কী আনন্দ তার? এজন্যই কী তোমাকে পাঠিয়েছে? নিষ্ঠুর, ভীষণ নিষ্ঠুর তোমার বন্ধু।

রাধার অভিযোগে উদ্ধব কেঁপে উঠল। বিব্রত গলায় ত্র্যস্তস্বরে উচ্চারণ করল: না, না। ওকথা বলে তাকে অপরাধী কর না। তোমার সন্দেহ ভীষণ মিথ্যে। অভিমানে কৃষ্ণকে ছোট করে দিও না। সত্যি, বৃন্দাবনের জন্য তার সদা চোখ ছলছল করে।

রাধার বুকের ভেতর একটু অধীরতা জাগল। শবীবের প্রতি

কোষে কোষে তার বিরহজনিত কষ্ট, দুঃখ যন্ত্রণা। দু'চোখ তার অভিমানে জ্বলে উঠল। বলল: ওর কোন মানে নেই। দুঃখবিলাস থাকে অনেক ভাগ্যবানের। আর জাগতিক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট থাকে অনেক ভাগ্যহীন মানুষের। জাগতিক দুঃখ না মিটলে দুঃখবিলাসিতা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। সে কথা তারা বিশ্বাসও করে না।

চমকানো বিস্ময়ে উদ্ধব উচ্চারণ করল: রাধা!

উদ্ধব-দা তুমি তো জান না, সে কি কষ্ট দিয়েছে আমায়? প্রতিটি দিন আমি কত কষ্ট ভোগ করি জান? কাল সারারাত তার সুরে তার মতই বাঁশী বাজালে তুমি, আর আমি ভাবলাম সে বুঝি এল আমার নীরব প্রার্থনায়। হৃদয় আমার প্রাপ্তির আনন্দে ময়ূরের মত নেচে ওঠল। বুকের ভেতর কত স্মৃতি এল আর গেল। কল্পনায় গোটা জীবনটাকে একবার নতুন করে দেখার আর বিচার করার সুযোগ হল। স্বপ্নের দরজা ভেঙে অতীত আমার বর্তমানের মধ্যে প্রবেশ করল। বর্তমানের সঙ্গে মিশে গেল। যে মানুষকে আমি কল্পনায় দেখছি সেই কায়াহীন, স্পর্শহীন মানুষ আমায় কিছুই দেয়নি জীবনে, শুধু কলংক দিয়েছে। আমাকে অপমান করার জন্য আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করেছে।

ছিঃ রাই! তুমি ভীষণ উতলা হয়ে পড়েছ, দুঃখে তুমি বিচলিত। রাগ, অভিমান তোমাকে মানায় না। লাভ-লোকসানের হিসাবের খতিয়ান নয় এ। এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোন সার্থকতা নেই বাস্তবে, অথচ সেই অবাস্তব অনর্থক ঘটনাগুলো দিয়েই মানুষের আর এক জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই তো তুমি কাল সারারাত ধরে নিজের অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছ — সে কি কম পাওয়া?

প্রণয়ের অকালমৃত্যু কোন বিশেষ ঘটনা নয়, এরকম স্মৃতির পীড়া অহরহ হচ্ছে এবং হবে।

কৃষ্ণ তোমার কাছে ফিরতে পারল না বলেই তুমি তার দুঃখ ও আর্তি টের পেলে না। বৃন্দাবনে সত্যিই তার আর ফেরার পথ নেই। এখন মথুরার রাজ্য পরিচালনার নেতৃত্ব কার্যত কৃষ্ণের উপর। সেখান থেকে এই মুহূর্তে তার সরে আসা খুব কঠিন। তার জীবনের মূল্যবোধ, মানদণ্ড রাতারাতি বদলে গেছে। এজন্য কৃষ্ণকে অপরাধী করা কিংবা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। দেশ শাসন করতে গেলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্রে সকলে সমান হলেও রাজ্যচালনার পোষাক যাকে পরতে হয়, ইচ্ছে করলেও সে আর সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারে না। চারদিকে তার বিরাট আড়ম্বর, চোখ ঝলসানো জৌলুষ, নানাবিধ বাধা নিষেধ। এই রাজকীয় ব্যাপারটা কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। বৃন্দাবনে ফিরে কৃষ্ণ যদি সহজ, সরল সাধারণ মানুষের জীবন গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তার বৃন্দাবনে ফিরে আসার সার্থকতা কোথায়? মথুরার কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের তাই তফাৎ আছে।

রাধার স্বরে অবাক বিস্ময়! কথা বলতে গিয়ে তার ভুরুর মধ্যস্থল কুঁচকে গেল। বলল : তফাৎ!

তুমি বল, বৃন্দাবনে এসে ধেনু নিয়ে যদি গোঠে যেতে না পারল, রাখাল বালকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে না পারল, ধুলো, বালি মেখে জননী যশোদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারল, যমুনায় খেয়া নৌকোর হাল ধরতে না পারল, স্নানের ঘাটে তোমাকে ইশারায় বাঁশীর সুরে কাছে ডাকতে না পারল, রাধা রাধা করে অস্থির না করল তাহলে বৃন্দাবনে থেকে সুখ কীতার? আর এসব না করতে পারলে তার বুকের ভেতরটা হু-হু করবে। বৃন্দাবনে যেভাবে তার জীবন কেটেছে সেভাবে বৃন্দাবনের সঙ্গে যদি মিশে যেতে না পারল তাহলে স্বপ্নভঙ্গ হবে বৃন্দাবনবাসীর। তাদের সে দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে সে চোখে

দেখবে কেমন করে? কৃষ্ণ বলে, তার রাজ-পোশাকটাই নাকি কাল হয়েছে বৃন্দাবনে যাওয়ার। বিশ্বাস কর রাই, বৃন্দাবনকে ভোলেনি কৃষ্ণ। কেমন করে ভুলবে তোমাদের? তারা সবাই আছে স্মৃতির দর্পণে।

রাধা করুণ দৃষ্টিতে উদ্ধবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। নিজেকে সেই মুহূর্তে বড় অপরাধী মনে হয়। শরীরের গভীরে অবসাদ টের পাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা তাকে ক্রমেই অধীর করে তুলল। আস্তে আস্তে বলল: কৃষ্ণ চিরকাল রহস্যময় মানুষ। কোনদিন তার মনের নাগাল পেলাম না। কি জানি, ওর মনে কি আছে? যে বৃন্দাবনের প্রতিটি ছেলেমেয়ে, আবালবৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী অকাতরে তাকে জীবনযুদ্ধে জিতিয়ে দিল, তাদের একবার চোখের দেখা দিতেও তার সম্ভ্রমে লাগল। আশ্চর্য তার সম্ভ্রমবোধ। শুধু একটা পোষাকের অহংকারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এত বদলে যায়? তবে, সে মিথ্যে বলল কেন; মানুষের শুভ কামনা করে, মানুষের ভাল চায়। এই কি তার মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, প্রীতি, সৌভ্রাত্রের নিদর্শন? হা ঈশ্বর, এতকাল পরে এত বড় একটা মিথ্যে কেন আমাকে শোনালে?

উদ্ধব বিব্রত বোধ করল। অসহায় চোখে তাকাল। শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল : আমি চাই, তুমি আরেকটু তাকে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা কর। তার অবস্থায় পড়লে তবেই তাকে বোঝা যায়। বিচার করা সহজ হবে। তারপর মৃদু হেসে মুগ্ধ গলায় বলল:

কৃষ্ণপ্রেম কি চাইলে মেলে,
অনুরাগ না হলে হৃদকমলে
কৃষ্ণপ্রেম কি ন'কড়া ছ'কড়া
কুড়িয়ে নেবে যারা তারা?

রাধার মুখে কথা যোগাল না। কিন্তু ভীষণ একটা ব্যর্থতার দুঃখে আর যন্ত্রণায় বুক খামচে ধরল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ভেতর ডুবে গিয়ে কথাগুলো স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আস্তে আস্তে বলল : আমি যদি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই; দেখা করবে?

উদ্ধব থমকে যায়। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল : মুক্ত প্রাণের দীপ জ্বালিয়ে তুমি পরাণ বঁধুকে প্রেমে বরণ করবে; এ কি প্রশ্ন করে জেনে নিতে হয়? হন্যমান এ শরীর মাঝে যার অজয় অমর সত্তার সত্তার — তার লাগি সারাদিন দীপ জ্বেলে বসে আছে কৃষ্ণ। তুমি সত্যি এই বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে রাধা? বল, তুমি য ' ব?

রাধার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। মনে হল, স কৃষ্ণপ্রেমে অবিশ্বাস করেছে। তাই, এমন একটা কথা ব... পারল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কথা বলতে পারল না। ক গভীরতা তাকে স্পর্শ করে রইল। তাই কি ভেতরটা তার এ অধীর? না, অন্য কোন প্রত্যাশা আছে। কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? নিজের মনের ভেতর কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা রাধাকে প্রশ্নে প্রশ্নে আকুল করল।

মনে হল একটা সূক্ষ্ম শরীর যেন তার স্থূল দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে আর তার স্থূল শরীরের মধ্যে নেই। পঞ্চভূতে যেন বিলীন হয়ে গেছে। আয়ানের কথাগুলো তার কানে বাজল; ধ্যানেই মন সুস্থ আর বিকারহীন হয়। তুমি ধ্যান কর তাকে, শান্তি পাবে। এতেই রাধার মন কানায় কানায় ভরে ওঠল। অনুভব করতে পারল তার সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমান থেকে অতীতের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল। এই দুঃসহ মানসিক ক্লেশকে প্রকাশ করার তার ভাষা নেই। খানিকটা অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ

পর. তার আবেগগাঢ় স্বর স্খলিত, ভেজা ও ভাঙা শোনাল। বলল : উদ্ধবদা তোমার কথা শুনে চমৎকৃত হলাম। এত গভীর করে কিছু ভাবতে শিখিনি। এখন মনে হচ্ছে কি আশ্চর্য, অলৌকিক তোমার কৃষ্ণ। নিয়তির মত এক অমোঘ সংকেতে রহস্যময়।

উদ্ধবের অধরে স্মিত হাসি। চোখের তারায় যেন অন্তর্ভেদী নিবিড়তা। স্বভাবসিদ্ধ সংযম রক্ষা করে রাধা একটু থেমে আহত ভাঙা গলায় বলল : কথায় সুধা ও বিষ দুই আছে। কথার ধারা কত বলবতী, কি তার বেগ, কত বড় ভয়ংকরকে সে আঘাত করতে পারে বজ্রের মত। আবার কথার অমৃত ধারায় বুক ভাসিয়ে নামে করুণা মায়া ভালবাসা। এই অনুভূতিতে উপলব্ধিতে তুমি আমার বিরূপ অন্তরকে এমন করে রাঙিয়ে তুললে যে এই বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় যেতে আর ইচ্ছে করে না। কি হবে মথুরায় গিয়ে? কি পাব সেখানে?

উদ্ধবের মুখে অনির্বচনীয় হাসির দীপ্তি। দু চোখের তারায় রহস্যের দ্যুতি উজ্জ্বল করল তার মুখমণ্ডল। মধুর কণ্ঠে বলল : রাধা, কৃষ্ণ যে তোমার অপেক্ষায় দীপ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে মথুরার প্রাসাদে।

রাধার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল। অবাক মুগ্ধ মুহূর্তে রাধার মনে হল, প্রেমের আলো অন্তরের গভীরে তাকে জ্যোর্তিময় করে তুলল। সমস্ত অন্তরটা তার আলোয় ভরে গেল। মনের অলিতে গলিতে সর্বত্র তার আলো জ্বলে ওঠল। তার নিজের যেটুকু ক্ষোভ, অভিমান অহংকার ছিল সব কেমন মিলিয়ে যেতে লাগল। একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। সত্যের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পেল। বাঁশীর সুর তার প্রাণে যে অনুভূতি জাগাল তার মনকে চঞ্চল অস্থির করল, অমরত্বের আস্বাদ দিল তাই তো অমর প্রেম। প্রেম, দেহহীন অস্তিত্ব নিয়ে তার মধ্যে বাস করছিল। তাই মনটা তারের বাজনার মত সুরে

ভরা ছিল, একটু ছোঁয়া লাগাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠেছিল। দয়িতের অদর্শনে প্রেম মরে না। প্রেম বিদেহী। তার আত্মা অসীম সীমার মধ্যে তরঙ্গিত।

উদ্ধবের আশ্চর্য সুন্দর কথাগুলো রাধার কাছে জীবনের অর্থটা বদলে দিল। নিজেকে নিজে প্রবোধ দিল। এ জগতে ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা কল্পনা ও ঘটনা এসবে কি এসে যায়? তার চেয়ে সত্য কিছু আছে। রাধার মনে বার বার প্রশ্ন জাগল কৃষ্ণ এমন করে মৃত্যুহীন প্রেমকে বিষময় করল। এ কোন কঠিন অগ্নিপরীক্ষা তার? শুধু চোখের দেখায় কি সব পাওয়া হত তার? তাদের পনেরো বছরে অদর্শন জনিত ব্যবধান কি শুধু কৃষ্ণের উপস্থিতি ঘুচিয়ে দিতে পারত? তাদের যুগলরূপ কি একটি মিলিত বৃত্তে পরিপূর্ণতা পেত? কখনই নয়। তার চেয়ে ধ্যানে শরীরের আত্মাকেই বেশী করে পাওয়া যায়। মোমবাতির মত একটু একটু করে রাধার শরীর গলছিল আর দেহমন জুড়ে এক আলোক শিখা ছড়িয়ে পড়ছিল, আর তার দহনে পুড়ে যাচ্ছিল প্রেমের গর্ব অহংকার অভিমান। রাধা নিজের মনের ভিতর নিঃশেষ হয়ে যেতে যেতে যেন বলছিল : সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। যুগান্তরের সংস্কার, বিশ্বাস, অভিমান, প্রেমের গর্ব দিয়ে গড়া এই অহংকার ইন্ধনের মত জ্বলছিল, আলোয় প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল। আর মনের গুহায় একটু একটু করে যেন আলোয় ভরে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর কেমন একটা নুয়ে পড়া শ্রদ্ধার ভাব জাগল। চিত্তে পূজার পবিত্রতা। নিজেকে ধন্য আর পূর্ণ হয়ে উঠার জন্যই মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করল ঃ মাথা নত করে দাও হে গুণী, তোমার চরণ ধুলার তলে।

রাধার নীরবতা দেখে উদ্ধব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল : রাধা, কৃষ্ণের উপর তোমার অভিমান এখনও গেল না? তুমি নিরুত্তর কেন, সত্য করে বল?

রাধা অভিভূত হয়ে গেল। দু চোখে তার জল টলমল করতে লাগল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। স্খলিত ভেজা গলায় বলল : উদ্ধবদা, অমন করে তুমি আকুল কর না। এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের স্মৃতি ছাড়া কি আছে আমার? যে দিকে চাই সব কানুময় দেখি। এই বৃন্দাবনের স্মৃতি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার পা উঠছে না। মন মানছে না। বৃন্দাবন রাধার একান্ত নিজস্ব জগৎ। এর বাতাসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে আমি কৃষ্ণকে পাব। মথুরায় আমার বংশীধারী কৃষ্ণকে পাব কোথায়? সেখানে গেলে ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান সারা হবে, থেমে যাবে বীণ। মথুরা আমার মরীচিকা। জেনেশুনে কেন মরীচিকার পিছনে ছুটে যাই? মথুরায় যে রাজত্ব করছে সেই কৃষ্ণকে অমি চিনি না, সে অন্য কৃষ্ণ। রাধার কেউ নয়। রাধা তাকে চায় না। সেখানে গেলে রাধার চিত্তে কোন স্মৃতি আমার জাগবে না। আশায় মায়ায় গড়া এই বৃন্দাবনই রাধার ভাল। তার আদিও থাকল অন্তও থাকল। আর থাকল অমরত্ব। বলতে বলতে রাধার গলা কাঁপছিল। চোখ দিয়ে টলমল করে জল পড়ছিল। আর একটা বুকভাঙা কষ্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে ঘরের মধ্যে পাক দিয়ে ঘুরছিল।

উদ্ধব চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘর থেকে একেবারে বাইবে বেরোলে হঠাৎ পিছন থেকে রাধার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে।।